দ্যুমন - জ্যোতির্ময় পুরুষ

লক্ষ্মীহউসে দ্যুমনভাই (২.১.৮৮)

দ্যুমন - জ্যোতির্ময় পুরুষ

শ্যামকুমারী

অনুবাদঃ উমা ঘোষ

শ্রীঅরবিন্দ ইনস্টিটিউট অব কালচার
৩ রিজেন্ট পার্ক
কলকাতা ৭০০০৪০

প্রথম প্রকাশঃ ২১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩

শ্রীঅরবিন্দ ইনস্টিটিউট অব কালচার,
৩ রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা-৪০ থেকে প্রকাশিত
ও গ্রন্থের সর্বসত্ব সংরক্ষিত ।

মুদ্রণ : জগদ্ধাত্রী প্রিন্টার্স,
৫৯/২ পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশিকার নিবেদন

গত ১৯ শে আগস্ট ১৯৯২ রাত সাড়ে দশটার সময় হঠাৎ আমাদের আশ্রমের একজন বন্ধু খবর দিয়ে গেলেন যে পন্ডিচেরী থেকে খবর এসেছে দ্যুমনভাই আর নেই। পরের দিন ভোরবেলায় এয়ারপোর্টে চলে গেলাম। সেদিন সকালে Madras flight নেই, তাই Bombay -র টিকিট কেটে সেখান থেকে Madras গেলাম। পন্ডিচেরী পৌঁছলাম সন্ধে ৭টা। আশাই ছেড়ে দিয়েছিলাম যে দ্যুমনভাইকে দেখতে পাবো কিনা। কিন্তু গিয়ে শুনলাম যে ওঁরা ঠিক করেছেন একদিন রাখবেন, তাই আমি দেখতে পেলাম। শান্ত, সমাহিত এই মহাসাধক ঠিক যেন ঘুমোচ্ছেন। ওঁর পাশে বসে অনেক সান্ত্বনা পেলাম। উনি আমাদের ইন্সিস্টটিউটের Chairman এবং আমি Secretary , এই সম্পর্কটা ছাড়াও ওঁর সঙ্গে আমার একটা ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, আমাদের পূর্ববর্তী Chairman প্রদ্যোতকুমার ভট্টাচার্য চ'লে যাবার পর। সেটা ছিল ১৯৮৪ সালের ২২ শে নভেম্বর। উনি সেদিন বলেছিলেন আমাকে যে, লক্ষ্মী হাউস যেমন চলছে ঠিক তেমন চলবে এবং এটা যে আশ্রমের nominee হিসেবে কাজ করছে তেমনিই করবে। এরপর থেকে আমার লক্ষ্মী হাউসের কাজের প্রতিটি details আমি ওঁর কাছে লিখেছি তার পরিবর্তে পেয়েছি অফুরন্ত উৎসাহ ও প্রেরণা।

একবার আমি আবদার করলাম যে "আপনি যে প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান সেই প্রতিষ্ঠান একবার চাক্ষুষ দেখতে আসা উচিত"- এবং উনি অবশেষে রাজী হলেন। ১৯৮৮ সালের ২রা জানুয়ারী উনি এসে আমাদের বার্ষিক প্রদর্শনী উদ্বোধন করলেন এবং ৩রা জানুয়ারী সকালে আমাদের নতুন Hall -এর উদ্বোধন করলেন নলিনীদার শতবার্ষিকীর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। উনি আশ্রমের বাইরে এলেন বহুবছর পরে, কিন্তু আমাদের ব'ললেন যে এখানকার পরিবেশ আশ্রমেরই মত। পরের দিন ভবন এবং পাঠমন্দির দেখে বিকেলের flight -এ ফিরে চলে গেলেন।

আমাদের স্কুলের শ্রীবৃদ্ধির মূলে ওঁর প্রেরণা সব থেকে মূল্যবান। উনি আমাকে একবার লিখলেন যে teacher -দের আর student-দের পন্ডিচেরী নিয়ে যেতে। আমি পর পর দুবছর নিয়ে গেলাম, ১৯৯১ সালের পূজোর সময় আমরা মোট ৭২ জন গিয়েছিলাম। দ্যুমনভাই কি খুশি। আমরা যখনই পন্ডিচেরী যেতাম একদিন দ্যুমনভাই -এর সঙ্গে Gloria যেতাম- সে আলাদা আনন্দ। আমাদের ছাএছাত্রীরা সাংস্কৃতিক

অনুষ্ঠান করল Ashram school compound-এ। উনি কি খুশি তার ঠিক নেই। আমাদের এই স্কুলকে উনি অনেক বড় করতে বলে গেছেন। আর আমার ওপর আর একটি কাজের ভার দিয়েছিলেন, সেটি হচ্ছে Sri Aurobindo 's Home Coming -এর শতবর্ষিকী এখানে, লক্ষ্মী হাউসে, খুব ঘটা করে পালন করতে। আমরা চেষ্টা করছি ভাল করে এই মুহূর্তটিকে ধরে রাখতে।

দ্যুমনভাইয়ের কথা লিখতে গেলে শেষ হবে না। ওঁর অপার স্নেহ , মমতা হাজার কাজের মধ্যেও প্রতিদিন চিঠি লেখা , যার উনি উত্তরও আশা করতেন না এই সবই যেন আমরা প্রাপ্য বলে ধরে নিয়েছিলাম। সেই নিরহঙ্কার অমায়িক একনিষ্ঠ মা-শ্রীঅরবিন্দের সেবকের কোনও সেবাই আমরা করতে পারলাম না, শুধু নিয়েই গেলাম। তাই শ্যামকুমারীর ওঁর এই আত্মজীবনীটি উমাদিকে (শ্রীঅরবিন্দ নিলয়) দিয়ে অনুবাদ করিয়ে গঙ্গাজলেই গঙ্গা পূজা করলাম। শুধু প্রার্থনা - তাঁর জীবনের সার্থত্যাগ , সমর্পন ও একনিষ্ঠ সেবার আদর্শ যেন আমাদের জীবনে একবিন্দুও বর্ষিত হয়।

জয়া মিত্র

দ্যুমন -জ্যোতির্ময় পুরুষ

এখানে দেওয়া হ'ল - মহত্ত পেরনাময়, দিব্য-সেবক জীবনের কাহিনী। শ্রী অরবিন্দের দৃষ্টিতে যিনি "দ্যুমন"- "The Luminous One".

এ কাহিনীর খানিকটা আশ্রমের গঠন ও বিকাশ সম্পর্কিত 'God's Labour' বা " দেবতার তপস্যা" নিয়ে। এবং এই প্রয়াসের মধ্যে আছে এমন একজনের ভূমিকা, যাঁকে শ্রীমা বরন করে নিয়েছিলেন এইভাবে- "তুমি এসেছ তাঁরই সেবার জন্য"

মৃদু-ভাষী, গভীর আবেগপ্রবণ দ্যুমন- ভাই কদাচিৎ তাঁর বাক্য সম্পূর্ণ করেন। এই প্রসঙ্গে আমি তাঁর ব্যবহৃত শব্দ ও ভাষা যতটা সম্ভব অপরিবর্তিত রেখেছি। এবং আগাগোড়া তাঁর ভাষায় বলবার ভঙ্গিটি (উওম পুরুষে) রক্ষা করেছি। কিছু শব্দ চয়ন নিজস্ব হ'লেও বর্ননার ব্যক্তিগত সুরটি বজায় আছে।

দ্যুমন ভাই পান্ডুলিপিটি দেখে প্রকাশের অনুমতি দিয়েছেন।

-শ্যামকুমারী

আমার শৈশবকালের পারিবারিক আবহায়ার কথা কিছুই মনে পড়ে না।

সারা জীবনটাই একলা কেটেছে। ১৯১৪ সালের মে মাসের ঘটনা। একদিন পরিষ্কার দৃঢ়কন্ঠে কোন এক শক্তি বলে উঠলেন "তোমার জীবন সাধারণভাবে কাটিয়ে দেবার জন্য নয়। অন্য কিছু - উষ্ততর কোন কিছুর জন্য এসেছ" আমার বয়স তখন এগারো বছর।

এখন থেকে এই আমার শক্তি আমার জীবনে পথের একমাত্র দিশারী। যিনি কখনো আমাকে পথভ্রষ্ট হতে দেননি,

সংসার -জীবনের দিকে যাবার সম্মতিও দেননি। ধীরে ধীরে আন্তর সত্তার বিকাশ হ'তে লাগল,আমাকে উষ্ততরের সন্ধানে এগিয়ে নিয়ে যেতে।

১৯২০ সালেই প্রথম শ্রীঅরবিন্দের নাম শুনলাম। শুনতে পেলাম- শ্রীঅরবিন্দ একজন রাজনৈতি নেতা। যোগ করেন এবং মাটির ৬" উর্ধ্বে অবস্থান করেন এই সময়ে। স্বভাবতঃই খবরটি আমাকে বেশ নাড়া দিয়ে গেল। কিন্তু ধীরে ধীরে ব্যাপারটি মন থেকে মুছে গেল। কিন্তু কিছুদিন না যেতেই আবার তাঁর নাম শুনলাম। বিদ্যালয়ে ছেলেদের স্কাউট দলের প্রত্যেকটির নাম এক এক মহাপুরুষের নামে। যেমন বিবেকানন্দ-দল , তিলক-দল ইত্যাদি। আমাদের দলটির নামকরণ হ'ল অরবিন্দের নামে।

যে উচ্চতর শক্তি পরিচালনা করছিলেন -আমাকে কোন স্থানে সুস্থির হতে দিচ্ছিলেন না। কত সাধু পুরুষ, যোগীজনদের কাছে যেতাম। হরিদ্বার, গুরুকুল, শান্তিনিকেতন ও বেলুড়মঠে গেলাম কোথাও সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। তারপর এলাম গান্ধীজীর সংস্পর্শে। অসহযোগ আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবক হলাম। তাঁর সবরমতি আশ্রমেও গেলাম। আশ্রম-অধ্যক্ষ জিজ্ঞাসা করলেন-"মা-বাবার সম্মতি নিয়ে এসেছ ত ?" 'না' বলাতে তিনি আমাকে গ্রহণ করতে রাজী হলেন না।

কমলা-বেনের আত্মীয়া ভক্তিবা আমাকে স্নেহ করতেন। তাঁর সঙ্গে কাজ করতাম- স্বেচ্ছা-সেবী যেমন করে তার দলপতির জন্য। ১৯২৪ সালে পন্ডিচেরী ভ্রমন সেরে সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের বাড়িতে তিনি রইলেন কিছুদিন। একদিন বিকালে ছাত্রাবাসের ঘরে বসে সুতো কাটছি। সেদিন আমার না থেমে ২৪ ঘন্টা সুতো কাটার দিন ছিল। সর্দার প্যটেলের বাড়ী থেকে ৪ মাইল দূরে আমাদের ছাত্রাবাসে ভক্তিবা প্যটেলের ভাইপোকে পাঠালেন আমায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। সে খবর দিল "ভক্তিবা পন্ডিচেরী থেকে ফিরেছেন- তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান।"

আমি সুতো কেটে চলেছিলাম। পন্ডিচেরী শব্দটি আমার সত্তার মধ্যে প্রতিধ্বনিত হ'য়ে ফিরতে লাগল। এক মুহূর্তে সব যেন মিলিয়ে গেল। গান্ধীজী আর রইলেন না- চরকা , খদ্দর সব সরে গেল। যোগী ও অন্যান্যদের জন্য কোন স্থান রইলনা মনে। এমন কি বিবেকানন্দ- রামকৃষ্ণ যাঁদের আমি গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতাম তাঁরাও যেন হারিয়ে গেলেন সেইমুহূর্তে। চেতনার পটভূমি থেকে একে একে সব অপসৃত হ'ল। রইল কেবল একটি নাম -পন্ডিচেরী।

মনের এই অবস্থা নিয়ে ভক্তিবার সঙ্গে দেখে করতে গেলাম। তিনি আমার অন্তরের কথা জানতেন- আর জানতেন আমার জীবনের গতি কোনদিকে। তার জন্য আমি সবই করতে প্রস্তুত থাকতাম। তিনি আমার পুরানো নামে সম্বোধন করে বললেন- "চুন্নীভাই তোমার স্থান আমাদের সঙ্গে নয়। তোমার স্থান অরবিন্দবাবুর কাছে। তাঁর কাছেই যাও। "

আমি তখন সবে একটি তরুণ। উনি আমার অরবিন্দ বাবুর কাছে যেতে বলছেন- কিন্তু কেমন করে যাব আমি! ভক্তিবা আমার জন্য তাঁর নিকট থেকে অনুমতি আনলেন। এবং আমার যাত্রার সব রকম ব্যবস্থাও করলেন ১১ই জুলাই, ১৯২৪ সালে পন্ডিচেরীতে পৌঁছুলাম আমার স্ত্রী কাশীবাঈ সহ। আট বছর বয়সে আমাদের বিবাহ হ'য়েছিল।

আশ্রমে পৌঁছে আমরা বসেছিলাম গেটের বাইরে এখন যেখানে দারোয়ানরা বসে। অমৃত তখন একটি কিশোর বালক মাত্র, আমাদের কাছে এসে বললেন- উপরতলায় যাও,-

সেখানে সেখানে শ্রীঅরবিন্দ তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। দুজনেই উপরে গেলাম। একটি বিরাট আকারের চেয়ারে রং ময়লা ,রোগা একজন বসেছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন- 'কেন এসেছ'! বললাম 'যোগের জন্য'। জিজ্ঞাসা করলেন 'যোগের বিষয়ে কিছু জান', কিছু বলবার আগেই উনি নিজেই প্রায় ঘন্টাখানেক যোগের কথা বলে গেলেন। অনেক কথাই বলেছিলেন সেদিন। আমার শুধু এইটুকুই মনে পড়ে - আমার হৃদয়টি যেন তাঁর হয়ে গেল , আর এখন পর্যন্ত তাঁরই হয়ে আছে। এমনকি আজ ৬৫ বছর পরেও। মানুষের মনে কত প্রশ্ন , কত সংশয় থাকে। কিন্তু আমার মনে ওসব কিছুই ছিল না। আমার হৃদয় শুধু বলে উঠল "তুমি আমার সর্বস্ব -আমার জীবন-আমার গৃহ।" এই স্থানকে আমি আশ্রম বলে ভাবিনা- বলতাম এই আমার আপন গৃহ। আমার মধ্যে ছিল এক অবিকম্প বিশ্বাস। শ্রীঅরবিন্দ আমার প্রভু, পন্ডিচেরী আমার স্বস্থান- আমার আবাস। তাঁদের যা আছে তা-সব আমারই। আমার কোন কিছুর জন্য তাই ভাবনা ছিল না কোন দিন।

কাশীবাঈ তাঁর সোনার বালা দুটি শ্রীঅরবিন্দকে উৎসর্গ করতে চাইলেন। তিনি বললেন-'এগুলি দিয়ে আমি কি করবো , আমি বললাম- আপনি ঠিক করুন যদি চান বিক্রী করে দিন।'

সেই এক দর্শনেই সব বদলে গেল- সব ঠিক হয়ে গেল আমার জন্য।

প্রথম যাত্রায় সেবার দুই মাস মত ছিলাম পন্ডিচেরীতে। ঐ সময়ে 'আশ্রম' বলে কিছু ছিল না। শ্রীঅরবিন্দ বাংলা থেকে যে কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে আসেন তাঁরাই তাঁর সঙ্গে থাকতেন সে সময়। নলিনী, সুরেশ, বিজয় এবং সৌরিন। অরো কজন যেমন পুরানী, পুণমচাঁদ, চম্পকলাল এবং রাজঙ্গম প্রভৃতি গেস্ট হাউসেই বাস করতেন।

আবার তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ল যখন আমাকে বাড়িতে ফিরে যেতে বললেন। আমি চলে গেলাম -কিন্তু প্রতি সপ্তাহে তাঁকে বাড়ী থেকে লিখে জানাতে ভুলতাম না "আমি ফিরে যেতে চাই ওখানেই' - 'না' যেখানে আছ সেখানেই থাকতে হবে" তিনি উওর দিতেন। আমি ছাড়াতাম না- লিখেই যেতাম এক কথা। ক্রুদ্ধ হয়ে একবার লিখলেন "কে তোমাকে যোগ শিখিয়েছে "? উওরে লিখলাম- "আপনি যা স্থির করবেন করুন-কিন্তু আমার প্রভু আপনি।" উনি সেবার লিখলেন "সময় হ'লে ফিরতে পার"।

যখন আমি দূরে তখন তিনি আমাকে প্রস্তুত করলেন এই ভাবে। এমন কি আমি তাঁকে দেখার আগেই শ্রীঅরবিন্দ আমার কাছে ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের চাইতেও বেশী কিছু। ১৯২৬ সালের নভেম্বরে মীরা আলফাসাকে তিনি 'মা' নামে অভিহিত করলেন। কিন্তু

১৯২৪-এ যখন আমি প্রথম আসি তাঁকে দর্শন করবার পূর্বেই তিনি ছিলেন 'মা' আমার কাছে। তাঁকে দর্শনের জন্য বিশেষ অনুমতির প্রয়োজন হ'ত। কারণ তখনও কারুর করুর প্রশ্ন ছিল-কে এই মা ? কিন্তু আমার কোন প্রশ্ন ছিল না তাঁর সম্বন্ধে।

যখন আমি বলামাত্র, পড়তে যেতাম শহরে। আনন্দ ছিল শহরের নাম। পাঠের প্রথম বিষয় ছিল "প্রাচীন ভারতের বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার পদ্ধতি কেমন ছিল? যেমন তক্ষশীলা-নালন্দা ইত্যাদি স্থানের আশ্রম গুলির পরিচালনা কেমন ছিল ? গুরু -শিষ্য সম্পর্ক কি রকম ছিল ? প্রশ্নগুলি নিয়ে গভীর ভাবে পড়াশুনা করতাম। দেখা গেল গুরু-গুরু সন্তানেরা ,অধ্যয়ন রত শিষ্যেরা সব একই সঙ্গে বসবাস করতেন। কিন্তু সন্তান ও শিষ্যদের মধ্যে একটা পার্থক্য রক্ষিত হ'ত। আমার কাছে এই ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়নি। পন্ডিচেরীতেই দেখতে পেলাম এ ব্যাপারে কোন প্রভেদ মানার রীতি নেই। এই কারণেই শ্রীমাকে দর্শন করবার আগেই ভালবাসতে পেরেছিলাম এবং তাঁকে যথার্থ মা বলে জেনে ছিলাম। যদিও তখন পর্যন্ত তিনি আশ্রমের ভার গ্রহণ করেননি তবুও তাঁর সম্বন্ধে আমার ধারনা একইরকম ছিল.

যদিও জানতাম না তখন রূপান্তর বা অতিমানসের তত্ত্বকে কিন্তু শৈশবকাল থেকেই কিছু ধারনা অন্যরকম ছিল। অতীতকাল থেকে স্ত্রী পুরুষ মাধ্যমে যে প্রাচীন প্রজনন পদ্ধতি চলে আসছে তা সত্য বলে মনে হ'ত না। আমার আন্তর-সত্তা জানতেন সৃষ্টির অন্য পথও আছে। ১৯১৪ সালের মে মাসে যখন ৬ষ্ঠ শ্রেনীতে পড়ি , একদিন বন্ধুদের নিয়ে একটি নিম গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ খানিকটা মাটি তুলে নিয়ে আমি বলে উঠলাম - এই মাটিকে একটি শিশুতে পরিণত করা যায়। নূতন সৃষ্টি পদ্ধতির বিষয়ে অন্তর্জ্ঞান ছিল। যদিও ধারনা ছিলনা কিভাবে - কখন বা কোথায়।

'আর্য' পত্রিকা পড়া শুরু করলাম ১৯২০ সাল থেকে। বুঝতে পারছি কিনা পড়তে গিয়ে একথা নিয়ে মাথা ঘামাতাম না। পড়তেই ভাল লাগত লেখাগুলি। 'বেদ-রহস্য' আমি তিনবার পাঠ করেছি। কবিতা আমার বিষয় নয়- কিন্তু Future Poetry পড়তে আমার ভালই লাগত।

১৯২৬ -এ শ্রীঅরবিন্দ অন্তরালে যাবার পর আশ্রমে যোগ দেব ঠিক করলাম। পিতা-মাতার দিক থেকে ঘোর আপত্তি উঠল। যদিও আমার অল্প বয়স্কা স্ত্রী তাঁদের বোঝালেন - "আপনারা বাধা দেবেন না, যাবেন স্থির করছেন দৃঢ় সংকল্প নিয়ে। বাধা দিলেও উনি যেভাবেই হ'ক চলে যাবেন। ঠেকাতে পারবেন না।"

পিতা-মাতা দুজনেই অসুস্হ ছিলেন-স্ত্রীও ছিলেন মূর্চ্ছারোগ আক্রান্ত। পিতা-মাতার ক্ষুব্ধ প্রশ্ন- " আমাদের কি হবে- কে দেখাশুনা করবে এই বয়সে-?" বললাম 'মা দেখবেন আপনাদের'। মা আমার কথা রক্ষা করেছিলেন। পিতা মহাশিবরাত্রির দিন ৯৫ বছর

বয়সে দেহ রক্ষা করেন। সেদিন তাঁর ছিল উপবাস। আহারে বসতেই দেহ ত্যাগ হ'ল শান্তিতে। মা -ও পরিণত বয়সে চলে গেলেন।

আমার অন্তরে কোন দ্বন্দ্ব ছিল না। গৃহ -ত্যাগের সিদ্ধান্ত এল স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে। আমার জীবনের ক্রম-বিবর্তন চলেছে ধাপে ধাপে অগ্রগতির ধারা বজায় রেখে। গান্ধীজী ও বল্লভভাই প্যাটেল আমাকে এ অসহযোগ আন্দোলন থেকে ছেড়ে দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। একজন বিশ্বস্ত কর্মীর দাবি ছিল তাঁদের আমার উপরে। তাঁদের কাছে আমার বিশেষ স্হান ছিল। সব পরিচিত মানুষের সঙ্গেই ছিল আমার সহজ হৃদ্যতা। কলেজ থাকাকালীন জড়িত ছিলাম। স্বাধীনতা আন্দোলন। পরীক্ষায় বসতে আমার সর্বনিম্ন সংখ্যার উপস্থিতির প্রয়োজন হ'ত। অধ্যক্ষ মহাশয় আমাকে তা সর্বদাই মঞ্জু করতেন। ১৯২১ সনে শান্তিনিকেতনে যোগ দেবার পর C.F Andrews মহাশয়ের সঙ্গেও আমার ছিল বন্ধুত্ব।

যে মুহূর্ত থেকে আশ্রমের কাজে প্রবেশ করলাম- সেই ক্ষণ থেকে আমার পুরানো দিনের প্রতি আর কোন আকর্ষণ রইল না। রাজনীতিক নেতারা আমাকে ফিরে যেতে চিঠি দিলেন আমি আমার সময়ের অপচয় করছি ভেবে নিয়ে। কিন্তু এখন ত সব ভার শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রী মায়ের হাতে। এমন কি গান্ধীজী যখন পন্ডিচেরীতে এলেন তাঁর সঙ্গে আমি দেখা করতেও যাইনি- যেহেতু শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সঙ্গে দেখা করেননি। যদিও আমি হঠাৎ কোন সম্পর্ক ছেদ করি না। ১৯২৭ সালে গান্ধীজীর লেখা শেষ চিঠি এল আমার কাছে।

১৯২৭ সনের মে মাসে আশ্রমে এসে পৌঁছে - মায়ের দর্শন পেলাম সেবার প্রথম। চন্ডুলাল প্রেমানন্দ ও আমি তিনজন একজন একসঙ্গে পৌঁছুলাম দর্শনে। তখন বেলা ১০টা। সকাল। শ্রীমা নিচে নেমে এলেন-বারান্দার সিঁড়িগুলির নিচের ঘরে। তাঁর দিকে তাকিয়ে এক দৃষ্টিতেই আমাদের সকলের অতীত জীবনের পরিসমপ্তি ঘটল। আমার জীবনের নূতন অধ্যায় শুরু হল সেই শুভক্ষণে। পুরাতনের সঙ্গে আর কোন সংযোগ রইল না। এরপর আমি কেবলি তাঁর হয়ে উঠলাম- সমগ্রভাবে চিরতরে।

এতদিনে শ্রীঅরবিন্দ গেষ্ট-হাউস ছেড়ে অন্য ঘরে গিয়েছেন। এখন পারুল যেখানে থাকেন সেটা আমার ঘর হ'ল তখন। বেশ কিছুদিন কাটাবার পর Atelair -এ আবার ঘর পেলাম। ১৯২৭ সনের আগষ্ট মাসে এখন যেখানে কার্ড-বোর্ডের বাক্স তৈরী হয় সেই যরে গেলাম থাকতে। ঘরের নামকরণ হয়েছিল Entire ' Consecration' (পূর্ণ উৎসর্গ) ।

১৯২৭ সনের ২২শে মে। মা আমাকে বললেন "চুনী ভাই তুমি সত্যেনকে ভাত পরিবেশন করবে" ? 'হাঁ-মা', উওরে জানালাম আমার সম্মতি। এইভাবে শুরু হয়ে গেল আমার আশ্রম জীবনের কাজ।

কয়েক বছর পর থেকে বাজারও যেতাম। সব কিনবার জিনিসের দাম জেনে নিয়ে মূল্য-তালিকা পেশ করতাম। তারপর মা আমাকে প্রয়োজনীয় অর্থ দিয়ে দিতেন। যা লাগবে দেখে শুনে কিনে আনতাম বাজার থেকে।অতি অল্প ব্যয়ে প্রয়োজনীয় কেনা-কাটা সারা হয়ে যেত। দিনে মাত্র ২ টাকা খরচ যথেষ্ট বলে মনে হ'ত। ঐ সময়ে আশ্রমে মাত্র কয়েকটি মানুষ ছিলেন। ১০০টি লেবুর দাম ছিল মাত্র ২৫ পয়সা। ১০০টি পাকা কলার দাম পড়ত মোটে ৩৬ পয়সা।

সে সব দিনে কাজের গুরুত্ব ছিল খুব বেশী। আশ্রমের দায়িত্ব গ্রহণ করবার পরেই মা প্রথমেই নলিনী,বিজয়,অমৃত ও আরো যারা ছিল তাদের সকলকে কাজ ভাগ করে দিলেন। মায়ের কথা ছিল পৃথিবীতে তিনি দিব্য-জীবন নামিয়ে আনতে প্রয়াসী। ব্যক্তিগত জীবনের রূপান্তর নয় কেবল। সমস্তটা জোর দেওয়া হ'ত নিয়মানুগত্যের সঙ্গে কর্ম-সম্পাদনের উপর।

নলিনীকে দিলেন ডাকচিঠি আনা-নেওয়ার ভার। সে সময় ফরাসী ও বৃটিশ ডাকঘর পৃথক ছিল। নলিনী তাঁর দ্বি-চক্র যানে উঠে ফরাসী ডাক-ঘর থেকে মায়ের যত পত্র আনতেন। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি ছিলেন ডাক-হরকরা। আবার মায়ের সক্রেটারীও। যখন মায়ের কোন বইয়ের অনুবাদ বা সাহিত্য সংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন উঠত মা তখন নলিনীকে জিজ্ঞাসা করতেন। নলিনী এমন বিনয়-নম্র মানুষ ছিলেন যে মা জিজ্ঞাসা না করলে তাঁর মুখ খুলত না। নলিনী, সুরেশ, সৌরীন ও বিজয় ঠিক যেন শ্রীঅরবিন্দের চারটি পুত্র ! স্কুল-কলেজ ছুটির বন্ধের মত বছরে এঁদের এক মাস মত ছুটি মিলত বাড়িতে ঘুরে আসবার জন্য।

অমৃত পরিচিত ছিলেন শ্রীঅরবিন্দের সেক্রেটারি হিসেবে। তাকে বাইরের অনেক কাজ দেখতে হ'ত। প্রতিটি খরচের হিসাব দাখিল করেছেন তিনি। আমার ছিল আহার্য পরিবেশন।

মা কাউকে একবার কোন কাজের দায়িত্ব দিলে তিনিই তার সব ভার নিতেন। দীর্ঘদিন ধরে তখন আমরা আপন আপন বিভাগীয় দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে যাচ্ছিলাম। 'আপনি এঁদের কাজ বদল করে দেন না কেন'-কেউ একজন প্রশ্ন করলেন মাকে। 'না-ওরাই চালিয়ে যেতে পারবে'-নিশ্চিন্ত কন্ঠে মা বললেন। যাকে যে কাজের ভার দিতেন তার সঙ্গে মা দিতেন নিজের শক্তি সেই শক্তির-সাহায্যে কাজ শুরু হ'য়ে গেলে মা কখনো তাকে বিঘ্নিত করতেন না। এমনি ছিল মায়ের কাজ অর্পন করবার রীতি। অনেক

অভিযোগ শুনেও মা বিচলিত হ'তেন না -কর্মচ্যুত করাতো দূরের কথা। কর্মীদের বিশ্বস্ততায় মার কোন সংশয় থাকতনা। মা তাঁর শক্তি সমুচিত প্রয়োগে ভারপ্রাপ্ত কর্মীদের নির্বিঘ্নে কাজ চালিয়ে নিয়ে যাবার পূর্ণ সুযোগ দিতেন। ১৯২৬-এর ২৪শে নভেম্বর পর্যন্ত দুই মাসের মধ্যে সব কাজ শৃঙ্খলার সঙ্গে নির্বাহিত হ'তে দেখা গেল।

মা আমার কাজে দিয়ে দিলেন পূর্ন স্বাধীনতা। কৃতজ্ঞ অন্তরে এই মর্যাদা স্বীকার করলাম। যদিও মাকে এজন্য কঠোর সমালোচনার সন্মুখীন হ'তে হয়েছিল তবু মা আমার কাছে কোন দিন প্রশ্ন বা কৈফিয়ৎ তুলতেন না। "সে নিজের ইচ্ছে মতই কাজ করে- তোমাকে জিজ্ঞাসা করে না কেন ?" প্রশ্নকারীকে জবাব দিতেন মা- 'হাঁ সে আমাকে সবই জিজ্ঞাসা করে নেয়। তাকে আমি প্রয়োজনীয় নির্দেশ সর্বদাই দিয়ে থাকি। সে নির্দেশ পালন করেই কাজ সম্পন্ন করে থাকে।'

মায়ের কাজের নির্দেশগুলি 'এটা কর'- 'ওটা করো' ধরণের হ'ত না। মাএ একবারই তিনি আমাকে তিনি আমাকে একটি কাজের কথা বলেছিলেন- "তুমি কি সত্যেনকে ভাত পরিবেশন করতে সাহায্য করবে ?" তারপর সুদীর্ঘ দিন ধরে আজ্ঞা পালনের ফলেই যেন কাজের একটা ধারা আপনা আপনি তৈরী হয়ে গেল। কাজগুলো যেন নিজেরাই এগিয়ে আসতে লাগল। যে কাজই আসুক আমি তা স্বস্তির সঙ্গে গ্রহণে অভ্যস্ত। পছন্দ-অপছন্দের কথা নেই। সর্বদাই মায়ের পরিচালনা শুধু বাইরে নয় ভিতর থেকেও মা পথ নির্দেশ করতেন। ব্যবহারিক দিক থেকেও - যেমন কোন মাশরুমগুলি তাঁকে খেতে দেওয়া যায়- মীমাংসাও আসত ভিতর থেকেই।

তখন আমাদের একমাএ লক্ষ্য ছিল মায়ের সেবা। যোগের বিষয়টি ক্রমে ক্রমে কাজের মাধ্যমেই বুঝতে শিখলাম। তিনি কাজের উপর কি ধরণের গুরুত্ব আরোগ করতেন তার একটি দৃষ্টান্ত দিলেই পরিষ্কার হবে। আশ্রম-জীবনের পক্ষে দর্শনের দিনগুলি তাৎপর্য কতখানি সকলেই জানেন। সকলে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই প্রস্তুত হন। আমি কিন্তু কোনমতে মাথার টুপিটি পকেটে ফেলে দর্শনের জন্য ছুটতাম। প্রণাম সেরেই আবার খাদ্য পরিবেশনে টেবিলে হাজির হতাম, লক্ষ্য করে মা একদিন আমাকে বললেন- "তুমি আমার কাজ কর, আমি তোমার কাজ করি।" 'তোমার কাজ' বলতে মা আমার সাধনা কথাই বলিছিলেন। কর্মই ছিল আমাদের সর্বপ্রকার গতি-বিধির কেন্দ্র যার চারদিকে চলত আমাদের নিত্য আবর্তন। মা নিজেই ছিলেন এই কর্মকান্ডের স্রষ্টা ও পরিচালিকা , একজন অনন্য শ্রেষ্ঠ উৎসর্গী কর্মী। আমাদের কথাটি ছিল "এস সবাই মিলে কাজ করি। এমন শুদ্ধ ভালবাসা ও পবিএ অন্তর নিয়ে খাদ্য প্রস্তুত করি যে তা যেন মাকে উৎসর্গ করা যায়।

তখন আর আমাদের অন্য বিশেষ কোন কাজ থাকত না। সকাল ৬টায় মায়ের স্নান হয়ে গেলে আমরা আশ্রম-বাড়ীর খোলা ছাদে গিয়ে উপস্থিত হতাম তাঁকে দর্শনের জন্য। ৭টায় আসতেন এরপর ধ্যানের জন্য। ৮টায় সাক্ষাৎকার। দশটায় আর একবার ধ্যানে বসা হ'ত। তারপর এগারো-সাড়ে এগারোটার মধ্যে ডাইনিং হলে আসতেন আমাদের খাওয়াবার জন্য। বিকালের দিকে গাড়িতে যখন বেড়াতে বের হতেন তখন তাঁকে আর একবার দেখা যেত। কোন কোনদিন ফিরে এসে আমাদের স্যুপ বিতরন করতেন। স্যুপ তুলবার আগে কড়াইয়ের উপর হাত দুটি মেলে ধরতেন। স্যুপের ভেতরে দিতেন তাঁর শক্তির স্পর্শ। আমরা তারপর একে একে কাপ নিয়ে। দাঁড়াতাম। প্রতি জনকে স্যুপ প্রসাদিত করে দিতেন যা প্রৎযক্ষভাবে চেতনা সঙচারে সহায় হত। আমরা এইভাবে দিনের প্রতিটি আমুহূর্তই প্রায় তাঁর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে থাকবার সুযোগ পেতাম। এমনকি একটু মাথা ধরলেও তাঁর কাছে ছুটতাম। ডাক্তারের কাছে যেতাম না। মায়ের কাছে গিয়ে প্রত্যক্ষভাবে উচ্চতর শক্তির সাহায্য লাভ করতাম। যদিও মা শরীরী উপস্থিতি নিয়ে ২৪ ঘন্টাই প্রায় আমাদের নিকটে অবস্থান করতেন তথাপি অন্তরে তিনি সর্বদাই শ্রীঅরবিন্দের চেতনার সঙ্গে যুক্ত থাকতেন এবং শরীর কোষগুলির রূপান্তরে নিমগ্ন থাকতেন।

তখনকার অবস্থায় আমরা ক্ষণিকের জন্য ঐ ঋজু পথটি থেকে বিচ্যুতি হবার কথা ভাবতে পারতাম না। কেউ কোন সাধকের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে তাঁকে আগতে জানাতে হ'ত। দরজার টোকা দিলে দরজা একটু ফাঁক করে যথা সম্ভব কথা কম বলে দরজা বন্ধ করতে হত। অন্তরের ভিতরে পূর্ণ নিবেদনের শিখাটির উপর একান্তভাবে মনঃসংযোগেরর চলত অবিরাম চেষ্টা। শ্রীঅরবিন্দ আর শ্রী মাকে নিয়ে ছিল আমাদের গৃহ, পরিবার- দেশ - জগৎ সর্বস্ব।

কঠিন নিয়মে বাধাঁ ছিল আমাদের জীবন ধারা। পন্ডিচেরীতে প্রথমবারে সঙ্গে আমার স্ত্রী ছিলেন। ১৯২৭ সালে যখন স্থীয়ীভাবে চলে এলাম তাঁকে রেখে এলাম। ১৯৩০ সালে তিনি এলেন নিজের প্রেরণায়। মা তাঁর থাকা , খাওয়া ও কাজের সবরকম ব্যবস্হা করে দিলেন। খাবার ঘরে তখন আমি খাদ্য পরিবেশনের দায়িত্বে। মা বলে দিলেন কাশীবাঈ-এর সঙ্গে যেন বাক্যলাপ না করি। 'তাই হবে মা' মাকে নিশ্চিত করলাম। নিয়মমত চিনির পাএ রাখতে বা নিতে সকলকে আমার ঘরে আসতে হ'ত। এমন ব্যবস্থা হয়ে গেল - কাশীবাঈকে এজন্য ঘরে আসবার দরকার হ'ল না। ইতিমধ্যে উনি দেশে ফিরে যাওয়া স্থির করে মাকে লিখে জানালেন- 'আমি ফিরে যাচ্ছি। আমি ওঁর সঙ্গে কথা বলতে পারলাম না। ফিরে যাবার পর বাড়ীতে ওঁর বিষয়ে কি বলব জিজ্ঞাসা করলে ?"

মা আমাকে কাশীবাঈএর সঙ্গে দেখা করবার নির্দেশ দিলেন। জিজ্ঞাসা করলাম - "মা তুমি কি থাকবে তখন ! মা জিজ্ঞাসা করলেন

'কেমন করে' ? আমি বললাম 'যখন তোমার কাছে কেউ বিদায় নিতে হলে তুমি উপস্থিত থাক' .সেই ভাবে উনি তোমার কাছে এলে আমি আসব তখন। তোমার উপস্থিতিতেই দেখা হবে আমাদের। মা এই প্রস্তাবে সন্মত হলেন। ঠিক বিদায় নেবার সময় এই ভাবেই দেখা হ'ল আমাদের মিনিট খানেকের মত। ১৯৩০ সালের কথা এটা। ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত আর কোন যোগাযোগ হয়নি। শুনলাম দক্ষিণ ভারতে তীর্থ ভ্রমণ উপলক্ষে এসেছেন-পন্ডিচেরীতেও আসতে পারেন। মাকে জিজ্ঞাসা করলাম 'তোমার কি ইচ্ছে-কি করব ? উওর দিলেন মা একটু কৌতুকের সঙ্গে 'তুমি তো সবাইকে নিয়ে কি ক্ষতি যদি দেখা কর ?" উওরে বললাম 'হাঁ-মা' .

সে যাত্রাতেও মিনিট খানেক দেখা হ'য়ে ছিল আমাদের। এরপর আরো একবার এসেছিলেন - কিন্তু সেবারেও ফিরে গিয়েছিলেন।

কিছু কাজের জন্য অম্বা প্রেমীকে আমাদের গ্রামে যেতে হয়। তিনি আমাদের বাড়ীতে গিয়ে কাশীবাঈ এর সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশী হন। অম্বা পন্ডীচেরী আশ্রমে তাঁর থাকার সমস্ত ব্যবস্থা করেন। এই কথা শুনে আমি খোলাখুলি ভাবে তাঁকে জানালাম। মনে রেখ তিনি এখানে দ্যুমনের স্ত্রী এই পরিচয় নিয়ে আসবেন না। আশ্রমবাসিনী হয়ে আসবেন। তিনি যেন না মনে করেন সাধারন জীবনের মত আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ হবে বা আমি তাঁকে কোন সাহায্য করতে পারব। আমরা এখানে স্বাধীন জীবন যাপন করব। তারপর আমাদের জীবন এখনও পর্যন্ত ঐ ভাবে চলছে।

১৯২৮ সালে শ্রী মায়ের কাছে আমার একটি নতুন নাম চাইলাম। 'এখনই আমি তোমাকে নাম দিতে পারি ফরাসী বা ইংরাজী ভাষায়' কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ তোমাকে সংস্কৃত বৈদিক নাম দেবেন।' "কিন্তু এখনও জানিনা কি নাম হবে- ওকে অপেক্ষা করতে বল" .শ্রী অরবিন্দ কিছুদিন আরো অপেক্ষা করতে বললেন ঐ কথা বলে। কিছুদিন অপেক্ষা করে আবার নাম চাইলাম। 'না - অপেক্ষা করতে বল ওকে'-আদেশ এল। তারপর এসে পড়ল ২৪শে নভেম্বরের দর্শন দিন। তখন দর্শনার্থীদের নামের তালিকায় ক্রমিকসংখ্যার উল্লেখ থাকত। সেই অনুযায়ী তাঁরা দর্শন পেতেন। দর্শনের পর শ্রী মা ও শ্রীঅরবিন্দ দর্শনে আগত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে কথা-বার্তা বলতেন। শ্রীঅরবিন্দ আমার নাম উল্লেখ করতেই মা সেই সুযোগে আমার নামের প্রসঙ্গ তুললেন। "এখনই ওকে নতুন নামটি দিলে হয় না" ? তখন শ্রীঅরবিন্দ সংস্কৃত অক্ষরে লিখলেন 'দ্যুমন', ইংরেজী একই সঙ্গে 'The Luminous one' .

১৯৩২ সালের জুনে আমি আমার ঘরে উঠে এলাম। সবাই ভেবেছিল মা ১৯শে জুন জন্মদিনে-আমাকে নতুন ঘরে দেবেন। উনিশের বদলে ২১শে জুন তিনি আমায় লিখে পাঠালেন 'দ্যুমন আজ তোমার নতুন ঘরে এস। আজকের দিনের আলোর স্থায়ীত্ব দীর্ঘতম-আর হতুমি হ'লে আলো'

শুভ-দিনটির উদ্‌যাপন উপলক্ষে মা তাঁরর রচিত ধ্যান ও প্রার্থনা বইয়ের পবিত্র পান্ডুলিপি থেকে নিম্নলিখিত দুটি প্রার্থনা কেটে আমাকে আর্শীবাদ পাঠালেন। মূল ফরাসী থেকে ইংরাজী অনুবাদ সহ।

দ্যুমনকে-র

পন্ডিচেরী ১৫ই ডিসেম্বর ১৯২৪।

হে প্রভু ! তুমি শক্তির সঙ্গে শান্তি এনে দিয়েছ আমাকে।

কর্মে দিয়েছ স্হির-প্রশান্তি , সকল পারিপার্শ্বিকতার হৃদকেন্দ্রে রেখেছ শাশ্বত সুখ আমার জন্য।

পন্ডিচেরি ২১শে জুন,১৯৩২।

দ্যুমনকে-

টোকিও, ১০ই অক্টোবর, ১৯১৮

হে আমার প্রভু-প্রিয়তম !

কত না মধুঁর এই চিন্তা যে শুধু তোমার জন্য- কেবল তোমারই জন্য আমি কাজ করি। তোমারই সেবার তরে আছি আমি। তুমিই তো-

সেই তিনি-যিনি সব স্থির করেন। নির্দেশ দেন ক্রিয়াশীল করেন- পরিচালনা করেন- কর্মটি সম্পাদনা করেন।

পন্ডিচেরী ২১শে জুন,১৯৩২

শ্রীমায়ের দেওয়া এই প্রার্থনা দুটিকে গ্রহণ করলাম আমার সমগ্র জীবনের সর্বোওম সার রুপে। ১৯৩৪ সালে আশ্রমে আসবার অনেক দিন পরে মাকে দেবার জন্য হিসাব লিখছিলাম। মা এসে আমাকে বললেনন 'দ্যুমন সত্যে কি প্রয়োজন হিসাব দেবার?' বললাম 'না' .মা যোগ করলেন 'আদৌ কোন প্রয়োজন নেই' . সেদিন থেকে হিসাব লেখা থেমে গেল। মা আরো বললেন 'কোন সমস্যা দেখা দিলে জিজ্ঞাসা করো আমাকে' .তিনি আমাকে প্রথম দেখার পর শ্রী অরবিন্দ বলেছিলেন "ও অনেক দূরে যাবে"

তিনি আমার ওপর বিশ্বাস ন্যস্ত করতেন। আমিও সাধ্যমত তাঁর বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করেছি। দিনে দিনে আমাদের আন্তরিকতা বেড়ে চলল। কারণ প্রতিটি ছোটখাটো কাজের ব্যাপারেও আমি তাঁর নির্দেশ মতই কাজ করতাম।

মূল লেখার ৮ পৃষ্ঠার নীচের পাদটীকার অনুবাদ--

দ্যুমনের মধ্যে বৈদিক অতীতের প্রবল সংস্কার জন্ম থেকেই আছ। বেদ-বিষয়ক পঠন-পাঠনে তাঁর বিশেষ অনুরাগ। গান্ধীজী প্রতিষ্ঠিত পুরাতত্ত্বের মন্দিরে ছাএদের সায়নাচার্যের রচিত বেদ-ভাষ্য অধ্যয়ন করতে হত। দ্যুমন এই বেদ-ভাষ্য গ্রহণ করতে পারেনি।তিনি শান্তিনিকেতনে চলে যান। যে অল্পদিন তিনি ছিলেন তারই মধ্যে বাংলা শিখে নেন। গুজরাটে ফিরবার পর নলিনীকান্তের রচনা মধচ্ছন্দের মন্ত্রমালা পড়ে গভীর ভাবে প্রভাবিত হন। তারপর শ্রী অরবিন্দের Secret of the Vedas অধ্যয়ন করে বেদ - পাঠের সূত্রটি আবিস্কার করেন। এক অর্থে তিনি পন্ডিচেরীতে বেদ অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে আসেন। গাভীর প্রতি তাঁর স্বাভাবিক আকর্ষণ। 'গো'

শব্দ বেদে আলোর প্রতীক। এখন গ্লোরিয়াতে প্রায় ৩০০ গাভীর এক বাহিনী সযত্নে পালিত হচ্ছে। উৎকৃষ্ট জাতির মহিষ তাঁকে উপহারের প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। মহিষ দুগ্ধ পছন্দ করেননা তিনি। শ্রীমা তাঁকে বলেছিলেন- মহিষের নয়, গো -দুগধই তোমার পাণীয়'

মা আমাকে দুটি নোট-বুক রাখতে বললেন। একটিতে লিখে যাব আমার ভেতরের কথাগুলি। অন্যটিতে আমার বাইরের কাজ-কর্মের বিবরন। যেমন কতজনকে খাদ্য পরিবেশন করেছি, কেমনভাবে তা করেছি, আবহাওয়া কেমন ছিল ইত্যাদির খবর। একটি খাতা দুপুরেই অন্যটি মাঝরাতে মার হাতে অর্পন করতাম। একদিন বললেন "আচ্ছা ! এগুলো কি লেখা দরকার"? "না -দরকার নেই" জানলাম তখনি মাকে। মা ঐ সঙ্গে বলে দিলেন 'যদি কোন সমস্যা আসে আমাকে জানিও।' নোট রাখা বন্ধ করে দিলাম এর পর। ইকি গভীর বিশ্বাস ন্যস্ত করেছেন আমার উপর ! ছিলনা কিছুই আমার নিজের - কোনরুপ লিখিত আদেশও নয় তাঁর। একদিন জাপানে তোলা তাঁর একখানি ফোটো দিয়ে আমাকে বলে দিলেন "এইটি কাছে রাখ। খাবার ঘরের দরজা খুলবার আগে ছবিটির সামনে একবার ধ্যান করে নিও সকালে, আবার রাত্রে ঘর বন্ধ করবার পর বের হবার আগে।"

শ্রীঅরবিন্দ তার ঘরে স্থায়ী ভাবে আসার পর- মাকে পিছন থেকে শক্তি দিতেন। সেই সময়ে শ্রীঅরবিন্দ নিজেই সবদি কে নজর রাখতেন ও পত্রাদি লিখবার কাজে ব্যাপৃত থাকতেন। মাা জেগে উঠে শ্রীঅরবিন্দের এই কাজে কোন সমস্যা থাকলে তাঁকে সেই ব্যাপারে সাহায্য করতেন। আমি এটা বুঝতে পারতাম কারণ মা উঠেই সদর দরজাটি (

যেটি টেরাসের দিকে ছিল) সেটি নিজে খুলতেন এবং আমাকে ডাকতেন- 'দ্যুমন' ! তখনি আমি একটা মই নিয়ে দয়ালের গা দিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে তাঁর কাছে উপস্থিত হতাম। মই নিলে সিঁড়ি দিয়ে ঘুরে যেতে হতনা আর। কিছু সময় বাঁচত। এই সময়ে তিনি আমাকে ঐ সব চিঠি পত্রের ভিতরে উত্থাপিত বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে পরিষ্কার করে দিতেন। তারপর সেসব শ্রী অরবিন্দকে গিয়ে বলবার পর তিনি উওর দিতেন।

১৯৩৮ সালে দুর্ঘটনায় ডান পায়ে আঘাত লাগার আগে কাজের কিছু ভাগাভাগি ছিল তাঁদের মধ্যে। দর্শন দিনের প্রণামীর অর্থ সব মা শ্রীঅরবিন্দের হাতে সমর্পণ করতেন। তিনি সব গুণে নিতেন নিজেই এমনকি অর্ধ-মুদ্রা পর্যন্ত। কিন্তু দুর্ঘটনার পরেই এ কাজ মায়ের হাতে এল।

এরপর যখন আবার শ্রীঅরবিন্দ পত্রোওরের কাজ হাত লাগালেন- তাঁর কাছে আবার আগের মতই চিঠি আসতে লাগল। একদিনে এল একবার ৭৫ খানি পত্র। সেই সময় আশ্রমিকদের সংখ্যা ছিল ২৫০ যে কেউ তাঁকে চিঠি লিখতে পারতো তখন।

ইংরাজী যাঁরা জানতেন না মাতৃ-ভাষা গুজরাটি বাংলায় লিখতেন। শ্রীঅরবিন্দ চিঠি ভাল পড়তেন নিজেই। অল্প স্বল্প গুজরাটি ভাষা জানতেন। ঐ ভাষায় লেখা পত্রগুলি তিনি অভিধানের সাহায্য উদ্ধার করতেন। সাধরণত ইংরাজীতে, কিছু কিছু চিঠি বাংলাতেও লিখতেন।

একটা সময়ে শ্রীমা সাধকদের বাড়ীতেও যেতেন। যখন যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল- চিঠির সাহায্যে যোগাযোগ রাখা হ'ত। পরে বিভিন্ন কর্ম-বিভাগগুলি তাদের হিসাব - পত্র দিতে শুরু করল। শ্রীঅরবিন্দের ঘরের দরজা বন্ধই থাকত। অবশ্য চিঠি ভিতরে দিয়ে যাবার ফাঁক ছিল।

কখনও আমি দিনে ৭/৮ টি করে চিঠি দিয়ে আসতাম। আমিও লিখতাম মাঝে মাঝে - ৭০/৮০ পৃঃ করে কোন কোন চিঠি। শুধু নীরবতাই ছিল তার উওর! কোন কোন মানুষকে তাঁরা হাজার হাজার পত্র দিতেন। কিন্তু আমার বেলায় থাকত শুধু নীরবতা। সেই সম্বোধন করতাম লিখতে হ'লে। মা একবার অসুস্হ হ'য়ে পরতে লেখা ছেড়ে দিলাম। সুস্হ হ'য়েই সরাসরি জিজ্ঞাসা- "তোমার নোটবুক পাঠাওনি কেন"? "কি করে পাঠাব তুমি তো অসুস্থ ছিলে" .তার উওর দিলেন মা "আমি তো চিঠি পড়িনা- এ ব্যাপারে শ্রীঅরবিন্দ তো সব দেখেন। উনি তোমার দেখা-শুনা করেন।

শ্রী অরবিন্দ আমাদের প্রত্যেকের প্রতি সদা-সর্বদা দৃষ্টি রাখতেন। দর্শনের কালে তিনি বালকদের প্রতিও দৃষ্টি রাখতেন। দর্শনের পর বিকেল পাঁচটার সময় মালা বিতরন হ'ত। একবার মালা বিতরণের সময় মা রমেনকে থামিয়ে বলেন- (রমেন তখন অল্প বয়স্ক বালক) "শ্রীঅরবিন্দ তোমার উপর খুব খুশি !" খুব খুশি হ'য়েছেন'!

স্থানীয় মানুষেরা মনে করতেন- আমরা "বিপ্লবী -বোমা তৈরী করি" ১৯৩০ সালে বটানিকাল গার্ডেনসে গাছপালা ও ফুলের একটি প্রদর্শনী হ'ল। আমরা ভাবলাম এই সুযোগে এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে আমাদের কাজও দেখানো যাবে। যখন স্থানীয় মানুষেরা এই সব দেখলেন তাঁরা খুবই বিস্মিত হ'লেন। এই মেলায় শহরের সব বিশিষ্ট নাগরিকরা উপস্হিত হয়েছিলেন। তাঁরাা ভাল করেই বুঝলেন তাঁরা ভুল বুঝেছিলেন। আমাদের সম্পর্কে তাঁদের মত পাল্টাতে হ'ল। আমাদের 'কার্ণেশন' ফুল তাঁদের সবচেয়ে বেশী অভিভূত করে। কি করে এ'রা এই অপূর্ব সুন্দর কার্নেশন ফোটালেন ? তাদের আশ্চর্য হবার কারণ কার্নেশন ঠান্ডা দেশে ছাড়াই এদেশে এমন বে ফুটতে পারে।

আমি ডাইনিং হলে ও বাগানে দুই যায়গাতেই কাজ করতাম। প্রদর্শনী উপলক্ষে আম্বু ও প্রতি সপ্তাহে তিনদিন বটানিকাল গার্ডেনে যেতাম। আমরা তখন এমন ছেলেমানুষ ছিলাম যে উত্তেজিত হ'য়ে তারদিকে কেবল ছুটোছুটি করতাম। ঐ তিনদিন আমাদের কোন খাবার জুটতনা। ডাইনিং হলের ভার প্রাপ্ত বলতেন "ওরা এখানে এসে খেয়ে যাক্" .কিন্তু প্রদর্শনী নিয়ে আমরা এতই মগ্ন থাকতাম যে আমাদের কারুর খাবার মনে থাকতনা। মা যখন পুষ্প-প্রদর্শনী দেখতে এসে এই কথা শুনলেন- নিরুপায় হ'য়ে বেঙ্কটরমনকে কাছাকাছি দোকানে পাঠাত বাধ্য হ'লেন। যাধকদের বাইরে খাওয়া একবারে নিষিদ্ধ ছিল। মা এ ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন- কিন্তু -এক্ষেত্রে বলেই দিলেন- এঁদের খাবার উপযোগী যা পাবে নিয়ে এস। তখনকার দিনে মা নিজেও কখনো কখনো কেনাকাটা করতে বের হতেন। উনি আপপাদুরাই ও মণি চেট্টির দোকান দুটিতেই যেতেন।

গোঁড়ায় সাধকদের আহার্য ভৃত্যদের হাতেই প্রস্তুত হ'ত। প্রতিদিন দুপুরে মা খাবার ঘরে আসতেন। সাধকদের জন্যয খাদ্য প্রস্তুত থাকত। এই সময়ে 'তারা' ও 'লীলা' আশ্রমে আসেন। তারার বয়স তখন মাত্র আঠার। সে মাকে বলল - "মা এরা কি আমাদের ভাই বোন নয়- আমি কি ওঁদের জন্য রান্না করতে পারিনা" তখন তারা সব সাধকদের রান্নার কাজে লেগে গেলেন। চারু ও আমি প্রস্তুত খাদ্য আশ্রম বাড়ীর ডাইনিং রুমে নিয়ে আসতাম।

তারা একটা সাধারন মাটির চুলাতে রান্না করতেন। একটা বড় মাটির হাড়িতে ৯৩ জন মানুষের ভাত চাপান হ'ত। একদিন ফেনা গালাবার সময় মাটির হাড়িটি ভেঙে গিয়ে তারার গায়ের উপর পড়ল। একমাস ধরে বেচারা খুব কষ্ট পেলেন। সারা গায়ে বড় বড় ফোস্কা উঠে গিয়েছিল। কিন্তু ভাল হয়েই আবার তারা কাজ শুরু করে দিলেন। এবার আর মাটির হাড়িতে নয় পিতলের হাড়ি ব্যবহার করতে লাগলাম। ভাতের ফেন ফেলে দেবার প্রথাও উঠে গেল।

১৯২৭/২৮ সালে হঠাৎ আবিস্কার করলাম যদিও আশ্রম মাথা পিছু প্রতিজনের জন্য ৭৫০ সি সি দুধ কিনছেন প্রতিদিনের পানীয় হিসাবে- সাধকরা কিন্তু সেই পরিমাণ খেতে পাচ্ছেন না। পাচ্ছেন ৬০০ সি সি মত প্রত্যেকের কোটা হিসাবে। চুপচাপ অনুসন্ধান শুরু করলাম , বাকী দুধটা যাচ্ছে কোথায়। প্রথমেই চোখে পড়ল দুধওয়ালা ফেন শুদ্ধু দুধটা মাপছে। দুধ ফোটাবার দায়িত্ব যাঁর - তিনি খেয়াল করেননি-দুধ কেন ফোটানোর ফলে পরিমাণ কমে যাচ্ছে। বিতরণের আগেই কেউ কেউ ইচ্ছে মত দুধ নিয়ে যাচ্ছেন। মাকে তখন জানালাম দুধের পরিমাণ কমিয়ে ৬০০ সি সি করে দিলে ভাল হয়। যদিও আমি চিঠি সর্বদা মাকে লিখি কখনো মা কখনও শ্রীঅরবিন্দ উওর দেন। এবারে স্বয়ং প্রভু লিখে জানালেন "দ্যুমন তোমার পাত্রটি ছোট মনে হচ্ছে" .আমিও তখনি তাঁকে জানালাম ৭৫০ সি সি প্রতিদিন প্রতিদিন প্রত্যেকের জন্য নেওয়া হ'লেও আমরা ৬০০ সি সির বেশী দিতে পারছিনা। প্রতিবারে খাবার সময় প্রত্যেককে দিনে মোট তিনবার ২০০ সি সি করে ভাগ করে দিলে ঠিক হ'তে পারে। প্রথম দিকে দুপুর বেলায় সময় আধ্ কাপ করে দই দিতাম আমরা। সাধকদের যাঁর যেমন দরকার সেই পরিমাণ চিনি দিয়ে দিতাম আমি। একজন সাধকের ৭ চামচ চিনিতে কুলতনা। বিষয়টি মাকে জানাতেই তিনি বললেন ৮-১২ চামচ চিনি প্রত্যেকের জন্য প্রতিদিন নির্দিষ্ট থাক। ১২ চামচ খুব বেশী কেউ কেউ বললেন। মার নির্দেশ হ'ল ৮-১০ চামচ দেওয়া হ'ক।

প্রতিজনের চিনির ভাগ একটি কোটায় করে নাম লিখে তাঁকে দেওয়া হ'ত। যাতে চিনির অপব্যবহার না হয় প্রত্যেকটি কোটায় সেলোফেন ফিতে দিতে বললেন মা। এই কাজটি আমরা শেষ করতাম মাঝ-রাতের দিকে।

দও প্রথম প্রথম সবজি সিদ্ধ করে শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দের জন্য স্যালাড তৈরী করে দিতেন। পবিত্র আবার আলিভতেল ইত্যাদি সহযোগে স্যালাডটি খাবার মত প্রস্তুত করে দিতেন। তখন থেকে শুরু হ'ল শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দের জন্য রান্না পাঠাবার রেওয়াজ। কোন কোন দিন অসতর্কতা জনিত ত্রুটিও থেকে যেতো। ধীরে ধীরে দওর রান্নাঘরের কাজ ভাল হ'তে লাগল। নাম হ'ল তার "শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দের রান্নাঘর". তারা ও লীলা দুজনে এই রান্নাঘরের যাবতীয় ভার নিলেন। পরে নির্মলাও যোগ দিলেন এঁদের সঙ্গে। নির্মলা চলে গেছেন কিন্তু তারা ও লীলা কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

১৯৩৪ সালে আমার 'নার্ভাস ব্রেক-ডাউন' ঘটল অতিরিক্ত পরিশ্রম করে। যখন আরোগ্য লাভ করলাম মা একটি অসাধারণ পথ্য দিলেন আমাকে। পবিএর টুপিটা মাথায় দিয়ে রোজ দুপুরে রোদে আধ ঘন্টা মত হাঁটতে বলে দিলেন। 'যদি তোমায় রোজ একটা করে ডিম খেতে বলি খাবে'? আগে কখনো তো ডিম খাইনি- তবু বললাম -তবু বললাম "হাঁ-মা". যদিও তিনি আমাকে ডিম খাবার কথা বলেছিলেন-কিন্তু কখনও খেতে দেননি।

সেদিন আমাদের ধারনাই ছিলনা যে আশ্রম এভাবে বড় হ'য়ে উঠবে। তখন মনে হ'ত বারো জনের মত লোক থাকবে- বেশী হ'লে ছত্রিশ জন বডজোর। তাই ফ্রান্স থেকে ৩৬ সেট্ এ্যালুমিনিয়ম বাসনের ক্রয়-ব্যবস্থা হ'ল। এখন যেমন ডাইনিং রুমে ব্যবহার হয় ঐরকম ৩৬টা নিচু টেবিলের ব্যাবস্হাও হ'য়ে গেল।

বেশীদিন লাগলনা ঐ সংখ্যা অতিক্রম করতে। যে হারে বেড়ে চলল তাতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সংখ্যাটি দাঁড়াল ১৯০ তে। যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবার পর ১৯৩৯ পর্যন্ত আমাদের জীবন -যাত্রায় তেমন কোন অসুবিধা ছিল না। আমাদের অর্থের প্রয়োজন ছিল কম। তখন আমরা মোটে কয়েকটি মানুষ ছিলাম। যুদ্ধ শুরু হ'তেই অনেকে এখানে আসতে লাগলেন আশ্রয়ের জন্য , আমার তো খাদ্য -বিভাগের দায়িত্ব থাকতই। বাড়ী-ঘর বাডানো অপেক্ষা করতে পারে- কিন্তু খাওয়া-দাওয়া নয়। একদিন আমি অত্যন্ত বিচলিত বোধ করতে লাগলাম। টাকা নেই বললেই চলে কি উপায় হবে। বাজারের পথ ধরে চলেছি। এখন যে রাস্তার নাম গান্ধী রোড,- সেখানে পৌঁছানো মাত্রই আমার সুক্ষ্মদেহ আমাকে কুবেরের ভান্ডার দেখাতে নিয়ে চলল। কুবের দেবতাদের রত্ন-ভান্ডারী, আমাকে সব দেখালেন এবং বললেন "ভাবনার কিছু নেই-সবই আছে।" পঞ্চাশ বছর গত হ'ল- আজও ঠিক স্মরণ আছে ব্যাপারটি কোথায় ঘটেছিল। সেদিন থেকে আর কোন উদ্বেগ নেই। এই ঘটনার পর সারাজীবন কাটিয়ে দিয়েছি যথার্থ বিশ্বাস রেখে যা আমাদের যখন প্রয়োজন তা মিলবেই কোন না কোন উপায়ে।

এসব ব্যপারে মায়ের কাছে আমি একটা দায়বদ্ধাতা নিয়ে থাকতাম। ১৯৩৭/৩৮ সাল তখন আমার বয়স বেশী নয়। তাঁর কাছে আমার এগিয়ে যাবার প্রবেশ পথটি ক্রমে ক্রমে খুলছে। যে কারণেই হ'ক পরস্পরের প্রতি আমাদের গভীর আস্থা ছিল। একদিন 'প' জনৈক পুরানো সাধক , মায়ের কাছে ভাইয়ের জন্য শ তিনেক টাকা চাইলেন। মা এসে বললেন 'প' কিছু টাকা চেয়েছে। সাধারণ তহবিল থেকে এ টাকা দেওয়া চলেনা, লোকেরাতো আমাকে সোনাও দেয়। এখন ও যখন টাকা চেয়েছে তখন আমি এটা কাজে লাগাতে পারি। আমার তিনশ মত টাকা- তুমি কি টাকাটা সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে পার ? মা প্রায় ২৪ ক্যারেট সোনা আমার হাতে দিলেন। 'দারা' পরিবারের দান থেকে। বাজারে গিয়ে সোনাটা বিক্রী করে যা পাওয়া গেল মাকে দিয়ে দিলাম। এই প্রথম সোনা হাতে নিয়ে কাজ। এর পর থেকে মূল্যবান অলঙ্কার বা সোনা আমার হাতেই দিতেন মা।

শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দ এ বিষয়ে খুব পরিষ্কার ও দৃঢ়মত পোষণ করতেন যে "আমরা দান বা অর্থ-সাহায্য কারুর কাছে চাইবনা। যদি 'Divine' ইচ্ছা করেন তবে আশ্রম চলবে নইলে আশ্রম বন্ধ করতে হবে" .দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সর্বাপেক্ষা নিরাপদ স্থান মনে করে আশ্রমে যাঁরা আশ্রয় নিয়েছিলেন তাঁদের সাথে ক্রমে বেড়ে যেতে লাগল।

ডাঃ R.S.Aggarwal সপরিবারে এসে পড়লেন। মাকে জিজ্ঞাসা করলেন- "আমার ছেলেদের লেখা-পড়া শেখাবার কি ব্যবস্থা হবে ?" মা তখনও কোন বিদ্যালয় খুলবার কথা ভাবেননি। ডাঃ আগরওয়াল খুব আগ্রহ ভরে বললেন- "মা ! সব জিনিস দেব- বিশেষ করে তোমার যত কাগজ-পেন্সিল লাগবে- সব"! যখন এসব তিনি জোগাড় করে দিতে শুরু করলেন তখন তো স্কুল খুবই ছোট। কিন্তু এখানে তো সব কাজই ক্রমে বাড়তে থাকে। মা এবার নিয়মিত অর্থ সংগ্রহের উপায় চিন্তা করতে লাগলেন। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল- প্রয়োজনীয় অর্থগমের জন্য আশ্রমিকদের অর্থের সম্বন্ধে নির্ভুল মনোভাব- দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার। অর্থের সঠিক ব্যবহারের জন্য এবং এসব ব্যাপারে মায়ের প্রতিও যথাযথ মনোভাব বজায় রাখার প্রযোজনীয়তা ছিল খুবই বেশী। কারণ এটা সব সময় ঠিক থাকতনা বলে নানারকম সমস্যার উদ্ভব হ'ত। মায়ের উপর নানারকম দাবি ক্রমে বেড়ে চলল- খরচও সেই অনুপাতে। স্বভাবতই এসব কারণে নানা সঙ্কটের সৃষ্টি হ'তেই থাকল।

মায়ের এখন অর্থর দরকার সবচাইতে বেশী, স্কুল আরম্ভ করতেই (Sri Aurobindo International Centre of Education) একদিন সকালে তিনি তাঁর যত মূল্যবান হীরে-জহরত, সোনা-দানা অলঙ্কারাদি সব একজায়গায় একত্র জড় করতে লাগলেন। আমি তখন সেখানে ছিলাম না। আমি তাঁর কাছে যেতেই বললেন "এইগুলো রাখবার জন্য কিছু বাস্ক নিয়ে এস।" ভারি দঃখ হ'ল আমার। বুঝতেই পারছ আমার ভিতরে কি হ'চ্ছিল তখন। কিন্তু তাঁর আদেশ পালন করতেই হবে। বাস্ক আনতে লাগলাম। ঐ সব জিনিস ভর্ত্তি করে যখন সাজিয়ে রাখলাম বাস্কগুলি একটার উপর একটা, তারা মাটিতে দাঁড়িয়ে ঘরের ছাদ স্পর্শ করল। তারপর তিনি আমাকে বললেন "আমি এগুলি সব এখন তোমার হাতে স'পে দিলাম- যা পার তুমি এখন কর।" "আমার টাকার দরকার।" শহর থেকে একটি স্বর্ণকার ধরে নিয়ে এলাম। শহরের স্বর্ণকার-পরিচিত জহুরী মিনু সোলেনা ও আমি আমরা তিনজন ২/৩ দিন ধরে ভিতরের ঘরের দিকে কিছুটা আড়াল এক একটি করে সব গুনে, ওজন করে লেবেল লাগিয়ে গুছেয়ে রাখলাম এবং তখনকার বাজারদর অনুযায়ী আমরা মোট জিনিসের মূল্য ধার্য করলাম। জিনিসগুলি যদি এখন বিক্রী করা সম্ভব হ'তো তবে কোটি টাকা পাওয়া যেত। কিন্তু সে সময়ে যে বাজার দর ছিল ঐসব জিনিসের তাতে তার দাম উঠলল মাত্র ১ লাক্ষ ৭৫ হাজার। মা বললেন এত কম। বললাম, মা তোমার জিনিসগুলি কি দাম চাই আমি তা জানি। এরপর আমার বিবেচনা অনুযায়ী মূল্য ধার্য করে নিলাম।

ঐ সময়ে মায়ের উপর একটা প্রবল চাপ চলছিল। ব্যাংক মালিক সর্তকর্মা এসে জানাত তার কি পরিমাণ টাকার কখন দরকার। আমি জানতাম আমাদের কখনো অত নগদ টাকা থাকত না। সন্ধ্যাবেলায় মায়ের একখনি গহনা নিয়ে বাজারে চলে যেতাম

বিক্রী করবার জন্য-কিংবা কোন বন্ধুর কাছে গিয়ে বলতাম- "এর বাজার দর এই- কিন্তু আমি এতটা চাই। এমনি করে বাজার দরে নয় মায়ের দরে বিক্রয়ার্থ সংগ্রহ করে -মা তাঁর ঘর থেকে নিচে নামবার আগেই আমি টেবিলের ভেতরে তা রেখে আসতাম।

এইভাবে আমাদের জীবন চলছিল, এই ব্যাপারে আমার আত্ম-বিশ্বাস ক্রমে বাড়াতে থাকল। এবং প্রচলিত বাজার দরের চাইতে অনেক বেশী দামই পাওয়া গেল মায়ের ঐ সমস্ত গহণা বিক্রী করে। মায়ের অনুযোগ। "তুমি আশ্রমের লোকদের ওগুলি দিতে গেলে কেন"- .- "আমার টাকার দরকার"। সত্যি কিছু কিছু জিনিস আমি তাঁদের দিয়েছিলাম প্রায় বিনা মূল্যেই বলতে গেলে। আংটি, শাড়ীর পিন ইত্যাদি, উওরে বললাম- "যারা সকলেই তোমাকে সব দিয়ে দিয়েছে তারা কিছু পেতে পারেনা মা তোমার কাছে।" সে সময়ে সাধকরা নিজেরা কিছুই রাখতেননা। তাঁরা নিজেদের সব কিছুই মাকে দিয়ে দিতেন। "আমি সব কিছু দেওয়া জিনিসের তালিকা রেখেছি-মা। সে রকম দিন যদি আসে আমি তাদের কাছে গিয়ে বলতে পারি- "এখন ঐ জিনিস ভাল আমাদের দরকার- ফিরিয়ে দাও"।

প্রতিটি জিনিসের দাম স্থির করে নেওয়া হল। তারপর আমার এক বন্ধুকে বললাম (ইনি মায়ের বিশেষ অনুরাগী) "এই জিনিসের বাজার দর এখন ৫০০০ , কিন্তু আমি তোমার কাছে ১০,০০০ মত চাই"। কখনও কখনও শুনতামই " আমার হাতে এখন এত টাকা নেই" আমি বলি - আমাকে পরে মূল্য দিতে পারো- কিন্তু টাকাটা আমি মাকে এখনই দিতে চাই" । ৫০০,১০০০,২৫০০০ যা হ'ক। আমি সর্বদাই কিছু টাকা এভাবে নিজের কাছে গচ্ছিত রাখতাম। কারণ তাঁর হঠাৎ টাকার দরকার পরতে পারে। যদিও সব টাকাটাই তাঁর প্রাপ্য। কিন্তু আমার কাজের জন্য যা দেওয়া হ'ত আমি তার থেকে কিছু ইচ্ছে মত বাঁচাতে চেষ্টা করতাম।

একবার -২৯ শে মার্চ বিতরন দিবসের জন্য কোষাধ্যক্ষের কিছু টাকার প্রয়োজন হ'ল ১লা এপ্রিল তারিখে। মা ডেকে পাঠালেন- 'দুম্যন এখানে এস। আমি তাঁর কাছে উপস্থিত হ'লাম। তিনি তখনি উঠে আলমারীর দিকে গেলেন। সেখান থেকে কিছু গহণা বের

করে বললেন "এটা এখন বিক্রি করে দাও, ২৫০০০ টাকা আমার এখন চাই"। বাজার কখন খোলা নেই জেনে বললাম - মা একটু

অপেক্ষা কর। আমি তাঁকে আমার কাছে গচ্ছিত ২৫,০০০ টাকা কয়েক মিনিটের মধ্যে এনে দিলাম। মা জিজ্ঞাসা করলেন- তুমি -এখন কি করবে ? মা- জিনিস গুলো বিক্রি করে দেব। ২৫,০০০ টাকা রেখে দেব। অবশিষ্ট অর্থ তোমার হাতে দেব।

মায়ের একটি রুবি বসানো সোনার মুকুট ছিল। তার কোনো Photo -তে দেখা যায় মুকুটটি পরে আছেন। এটিকে উনি বলতেন "দুর্গামুকুট"। জিনিসটির একটি বিশেষ মূল্য ছিল। মা নিজে বলেছিলেন এটিকে তিনি বিক্রী করবেন না। কিন্তু এমন চক্র যে একদিন মা আমাকে সেটি হাতে দিয়ে বললেন "তোমাকে এ জিনিসও বিক্রী করতে দিচ্ছি" -বললাম "তাই হবে মা"। তৎক্ষণাৎ মাথায় এসে গেল জিনিসটিকে নিয়ে কি করব। মুকুট 'গ'-এর হাতে অর্পণ করলাম। সে তখন বাইরে বারান্দায় উপস্থিত। আমি বললাম এর পরিবর্তে ১০,০০০ টাকা দরকার হবে। মুকুটটির যথার্থ অর্থ জানাই ছিল। শঙ্কর গৌড় এর জন্য জিনিসটি আমি তৈরী করিয়েছিলাম, সে মুকুটটি মাকে উপহার দিতে চেয়েছিল। তখন এর মূল্য লেগেছিল ৫০০০ টাকা। সে তুলনায় এখন সোনার দাম ১০০ গুণ বেশী হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। মা জিজ্ঞাসা করলেন- "কি করবে ভাবছ" ? "মা-এটা আমি 'গ' কে দেব ভাবছি"। মা তখনি 'গ' কে ডাকলেন। বললেন, 'গ' শোন। মুকুটটি খুব যত্ন করে রেখো। এর বিশেষ মূল্য আছে জেনো। যদি ঠিকভাবে না রক্ষা করতে পারে জিনিস- তাহলে সমূহ বিপদের আশঙ্কা আছে মনে রেখো।

আশ্রমের মানুষেরা - আরো কম বাইরের যারা- তারা বুঝতেই পারেননা মাকে কি রকম পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, কি ভয়াবহ "সঙ্কটের রাস্তা অতিক্রম করেছিলেন তিনি। আমি ছিলাম সে সব অবস্থার সাক্ষী- আর অংশগ্রহণকারীও বটে।

প্রথম প্রথম সাধকদের মানসিকতা ছিল অন্য ধরনের। দিন চলার জন্য যেটুকু মাত্র পয়োজন সেইটুকু খালি গ্রহণ করা মায়ের কাছ থেকে। বেঁচে থাকার জন্য একান্ত দরকার বিবেচনায় ছাড়া সাধকরা মায়ের উপর কোন চাপ দিতে চাইতেন না- তা সে যত সামান্যই হ'ক। তার মাকে কষ্ট দেবার কথা চিন্তা করতেই পারতেন না। কিন্তু এই মনোভাব স্থায়ী হ'ল না। মানুষের দাবি-দাওয়া ক্রমে বাড়াতে লাগল। মায়ের ছিল এমনই উদার মনোভাব- যে তিনি সব দাবি-দাওয়া প্রস্তুত থাকতেন। দিতে তিনি সিদ্ধ-হস্ত। বলতেন- "ওরা জানেনা ওরা কি করছে- যখন আমি থাকবনা- তখন বুঝতে পারবে ওরা কি পেয়েছিল"।

মায়ের একটি মুক্তার নেকলেস ছিল। দর্শনের দিনগুলিতে মা ওটি গলায় পরতেন। পরে এমন দুর্দিন এল যে সেটিকেও ত্যাগ করতে হ'ল। জিনিসটি 'ফ' কে দিলাম ২৫০০ টাকার বিনিময়ে। মা স্বভাবশুই জিজ্ঞাসা করলেন কাকে জিনিসটি দিয়েছি। এটা জিজ্ঞাসা করার কারণ ছিল। জিনিসটির ভতরে একটি আধ্যাত্মিকতার ভাবনা দিয়ে সেটিকে ঘিরে দিতে চাইছিলেন ।

কারুর পক্ষে কল্পনা করা সম্ভব নয় কি অবস্থা অতিক্রম করতে হয়েছিল আমাকে সে সময়। মাকে তাঁর সব কিছু এভাবে দিয়ে যেতে দেখতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যেত।

একদিন এমন হ'ল- একবার হাত শূন্য। মা আমাকে মাদ্রাজে গিয়ে কিছু অর্থ বিক্রী করে আসতে বললেন। 'ন' আমার সঙ্গী হ'লেন এ যাএায়। শহরের অনেক বিশিষ্টট লোককে উনি চিনতেন। আমরা একজন বিখ্যাত স্বর্ণকারের দোকানে পৌঁছালাম বেলা ১০ টায়। বেলা তিনটে পর্যন্ত বসে রইলাম অপেক্ষা করে। আমাদের কেউ লক্ষ করলেন না। অবশেষে স্বর্ণকার জানালেন "আমরা এ জিনিস নিতে পারিনা।" - 'কেন-কে নিতে পারেন ?" আমার জিজ্ঞাসা এরপর। উনি আমাদের 'বাটালাওয়ালার' কাছ যেতে বললেন। ওখানে গিয়ে আমি একটি বিশেষ দামের কথা বললাম। ওরা ঐ দামে জিনিসটি নিতে রাজী হ'লেন না। ফোনে মাকে বার্তা দিলাম "মা আমি জিনিসগুলি নিয়ে ফিরে আসছি'

ফিরে এসে মাকে খেলার মাঠে পেলাম। মা সব শুনে খুব অসন্তুষ্ট হ'লেন। শুধু বললেন "আমার টাকার প্রয়োজন"। "মা ওরা যে দাম দিচ্ছল সেই দামে আমি এ জিনিস দিতে পারব না , আমি একটা দাম ঠিক করে রেখেছি। আমি তোমাকে দ্বিগুন দাম দেব। " আমি তাঁকে টাকা দিয়ে দিলাম। একসময়ে জিনিসগুলি বিক্রী হ'ল- যখন নির্দিষ্ট দাম পাওয়া গেল।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট দিনটি এবার বিশেষভাবে উদযাপন করবার ইচ্ছে হ'ল। শ্রীঅরবিন্দের ৭৫ তম জন্মদিন বিরাট সমারোহের মধ্যে ১৩ই সন্ধ্যা থেকে ১৬ই পর্যন্ত। প্রতিদিনই নতুন কর্মসূচী থাকবে আর থাকবে ভালো আহার্য। আমার পরিকল্পনা ছিল এবার মায়ের পতাকা উত্তোলন করার। খোলা ছাদে ঠিক আমার ঘরের মাথার উপর, - আর একটি পতাকা আশ্রমের প্রাঙ্গণে। প্রথমেই কিনব মায়ের জন্য কিছু উপহার। কিছু হীরে জহরত্ প্রথমেই- তারপর পতাকার কথা। এবং খাবার দাবার। এই ভবেই মাকে দেব শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিনের উত্সর্গ অন্য ভাবে অন্য কিছু করার অর্থ ছিল না আমার কাছে। কিছু হীরে ও চুনী নিয়ে এলাম মায়ের জন্য। জিজ্ঞাসা করলাম - 'মা তোমার এগুলো পছন্দ ? যদি তোমার ভাল লাগে তবে আমার কাছ থেকে তুমি এগুলি নাও এখন - পরে তুমি এদিয়ে যা করতে চাও করো। আমি তোমাকেই দিলাম"। কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করল যদি ওগুলি বিক্রীর প্রয়োজন হয়- তুমি বিক্রী করতে পারবে যা তুমি নিজে দিয়েছ ? কিছু মনে হবে না তোমার ? বললাম- "একটুও না"। পরে সেগুলি আমাকেই বিক্রী করতে হয়েছিল।

আবার এল দিন - যখন হাতে কিছুই নেই। কি করা যায় ? তখন আমাদের সব অর্থ রৌপ্য মুদ্রায় রাখা হ'ত। একজন ব্যাংকার পরামর্শ দিলেন 'ওরকম নয়। তোমাদের রুপোকে সোনায় বদলে নাও'। সেই সময় সভার্নের Sovereign মূল্য ছিল ১৩ টাকা। আমরা সব রুপোর টাকা বদলে সোনা করে নিলাম। এগুলি একটা বাস্কে রেখে দেওয়া হ'ত। ১৯৪৯ সনের কথা - মা জানালেন , "আমার স্বর্ণ মুদ্রাগুলি বিক্রী করতে হবে -

একটি শর্ত আছে, ঐ স্বর্ণ মুদ্রাগুলির সমান মূল্যের আমাকে আগেই দিয়ে দিতে হবে। পরে সেগুলি নিয়ে যাবে'। মা জিজ্ঞাসা করলেন 'কতগুলি স্বর্ণমুদ্রা নিতে পার তুমি ?' "১০০টি নিতে পারি পারি"- আমি বললাম। "তাহ'লে সেই মূল্য -মানের সন্মান অর্থ দাও"। মাকে টাকা দিয়ে দেবার পর বললেন আমাকে - "তুমি এবার স্বর্ণ - মুদ্রাগুলি নিয়ে যেতে পার। এইভাবে তাঁর আমার প্রতি বিশ্বাস দিনে দিনে বেড়ে চলল। ধীরে ধীরে আমি মায়ের সমস্ত মূল্যবান অলঙ্কারগুলি বিক্রী করে দিলাম। পিতামহ /পিতামহীদের কাছে বংশগতভাবে পাওয়া অলঙ্কার সম্পদ সবই বিক্রী করে দিতে হ'ল একসময়। যদি মানুষ বুঝতে পারতো কি ভয়ানক সব সঙ্কট পেরিয়ে আসতে হয়েছিল তাঁকে তাহলে মানুষের দৃষ্টি-ভঙ্গী ও জীবনধারা অনেকখানি বদলে যেত।

আমি মায়ের যথা-সর্বস্ব এইভাবে বিক্রী করে দিলাম। কিছু আর রইলনা। ১৯৪৯ সনের কথা মা যখন জানলেন এবারে তাঁর শাড়ীগুলি বিক্রী করে দিতে চান-সত্যি আমি গভীর ভাবে বিচলিত হ'লাম। তাঁর মূল্যবান যত সম্পদ সব চলে গেল এখন শাড়ীগুলিও যাবে। এবার প্রবলভাবে আমার আপত্তি জানালাম। মা বললেন "আমার হাজার খানেক শাড়ী আছে। যদি কেউ লাখ খানেক টাকা দেয়- আমি তাকে শাড়ীগুলি সব দিয়ে দিতে পারি"। কিন্তু কেউ যেন না বলে "কয়েকটা নেব- কিছু টাকা দিয়ে দেব। "যারা নেবে তারা সবগুলিই নেবে একসঙ্গে- আর আমাকে লক্ষ টাকা দিয়ে দেবে"। একথা শুনবার পর আমি যদিও খুবই চেষ্টা করলাম কিন্তু কিছুই বিক্রী করতে পারলামনা সে বছর।

প্রতিদিন খেলার মাঠে মাকে যেসব উপহার ,প্রণামী ইত্যাদি দেওয়া হ'ত পরে সেগুলি আশ্রমে নিয়ে এসে খুলে দেখা হ'ত। উনি জিজ্ঞাসা করতেন- "এটা কি বা ওটা কি"। আমিও সেইভাবে বলতাম জিনিসটা কি- কে দিয়েছেন- কি ভাবে। উনি সব বলে দিতেন কোণ জিনিসটি কি ভাবে কি করতে হবে। ১৯৫২ সালের ২০ শে চন্দনা ব্যানার্জী মাকে একটি শাড়ী উৎসর্গ করলেন। যখন তাঁকে শাড়ীটি দেখালাম উনি জিজ্ঞাসা করলেন এটা দিয়ে কি করব ? মনে পড়ল তাঁর শাড়িগুলো বিক্রী করে দেবার প্রস্তাব। বললাম "এটা কিন্তু বিক্রী করে দিতে পারি আমি"। সেই রাত্রেই আমি 'নবজাতক'কে চিঠি দিলাম "শাড়ী কিনতে পারবেন" ? তখন নবজাতক ১ লক্ষ টাকা পাঠিয়ে দিলেন মাকে। সঙ্গে সঙ্গে লিখে দিলেন সবগুলি শাড়ীর মূল্য হিসাবে ঐ টাকা কিন্তু শাড়ীগুলি দ্যমনের কাছেই থাকবে- উনি ঐগুলি বিক্রী করে যে টাকা পাবেন- তাও মাকেই দিতে অনুরোধ করেছেন।

কেনাকাটার জন্য রোজই আমি বাজারে যেতাম। ফেরার পথে মায়ের সঙ্গে দেখা করে আসতাম। এইরকম একদিন যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ছি মা বসুধাকে বললেন- "শাড়ীগুলি নিয়ে এস"। শাড়ীগুলি আনা হল আমার হাতে দিয়ে দেবার জন্য।

করিডরে লম্বা লাইন পড়ে গেল শাড়ীর বাস্কোর। আমাকে মা বলতে লাগলেন "শাড়ীগুলি নিয়ে যাও"। বসুধাকে জিজ্ঞাসা করলেন "কতগুলি শাড়ী আছে এখানে"। গোণার পর দেখা গেল ১০০০ এর কম শাড়ী সেখানে। বসুধাকে বললেন "এম্ব্রয়াডারী করা শাড়ীগুলি নিয়ে এস- যেগুলি রেখে দিচ্ছে"। বসুধা এবার কান্নায় ভেঙ্গে পডল। কোনো সান্তনা নেই বেচারার। মায়ের ছোট বড কন্যারা প্রতিদিন ১০/১২ ঘন্টা পরিশ্রম করে শাড়ীগুলিতে কাজ করে দিয়েছে কত বছর ধরে। স্বভাবতই বসুধা ওই কাজ করা শাড়ীগুলি দিতে আপত্তি করছিলেন। মা কিন্তু অটল- "না সবগুলিই নিয়ে এস। বসুধা তখন ভলবাসার সেই অমূল্য স্মৃতিগুলি যা বছরের পর ধরে সঞ্চিত হয়েছিল মায়ের জন্য-প্রবল অনিচ্ছার বিরুদ্ধে তা আবার মায়ের চরণেই এনে দিলেন। বসুধা থাকতে না পেরে আমাদের গুজরাটি ভাষায় আমাকে কাতরভাবে অনুনয় করতে লাগলেন- "দয়া কররে এগুলি বিক্রী করবেন না"। মা জিজ্ঞাসা করলেন "ওরা কি বলছে"। বসুধার কথা পুণরাবৃত্তি করতে পারলাম না। বসুধাকে যথাসাধ্য ভরসা দিলাম - "দেখব কি করা যায়- ঠিক আছে"।

তাই যারা মায়ের শাড়ী পোষাক ইত্যাদি সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন- বসুধা , অনসূয়া, ইচ্ছা এবং মিনু তাঁরা সবাই আমার ঘরে একত্র হয়ে বসে ঠিক করে দিলেন- কোন শাড়ীর কি দাম হবে। যে ১০০ খঃনা শাড়ী মা বিশেষ ভাবে ব্যবহার করেছেন সেগুলি আমি আলাদা করে সরিয়ে রাখলাম। সেগুলির দাম ধার্য হ'ল ১০০-২৫০০ পর্যন্ত, আমার ইচ্ছা- ঐ সব শাড়ী থেকে মা আরো লক্ষ টাকা পাবেন। নবজাতর দান ছাড়া।

প্রতি দর্শন দিনে মা আর্শম-মহিলাদের শাড়ী বিতরন করতেন। একবার তিনি তাঁর সব কন্যাদের রেশম শাড়ী পরাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। শুনতে পেলাম মা কাউকে বলেছেন আমার আপনারা যারা তাদের আমি শাড়ীগুলি দিতে চাই। একথা শুনবার পর তখনি মায়ের কাছে গিয়ে বললাম "হাঁ , মা তুমি নিশ্চয়ই দেবে"। মাকে ৪৯৫ টি শাড়ী ফিরিয়ে দিতে পারলাম, এই ভাবে তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হ'ল। মা নিজে প্রত্যকের জন্য শাড়ী বাছতে বসলেন। প্রত্যেকের বয়স , প্রকৃতি , গঠন ও গায়ের রং বিচার করে শাড়ী ভাগ করে দিলেন- অতিযত্নের সঙ্গে অশেষ ভালবাসা নিয়ে।

তখনকার দিনে আশ্রমের সঙ্গে ফরাসী সরকারের খুব ভাল সম্পর্ক ছিল। ১৯৩৪ সালে ব্যাপারটা একটু অন্যরকম হ'য়ে গেল। বৃটিশ সরকার ফরাসী সরকারকে আশ্রম তল্লাস করবার জন্য চাপ দিতে শুরু করল। মা আমাকে ডেকে বললেন " আশ্রমে একটা তল্লাসী হবে- পুলিশ সব দেখবে, হানার পর সব তছনছ হ'তে পারে। ডাইনিং-রুমটা গভর্নরের বাড়ীর কাছে বলে সেখানেও ওরা হাজির হ'তে পারে। আমি সব খুলে রাখতে চাই। বলব দেখ যা দেখতে চাও- নিয়ে যাও যা নিতে চাও। ডাইনিং রুম ও খুলে রাখ।"

কিন্তু মায়ের ভাই ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকার শাসনকর্তা (Governor General) তখন। তাঁর প্রভাব ও হস্তক্ষেপের ফলে কিছু হয়নি এবং আশ্রমের উপরেও কোন উপদ্রব হয়নি সে যাত্রায়।

বরং ফরাসী শাসন-কর্তা মাকে দেখতে এলেন নিজেই। ফরাসী সরকারের এই প্রথম দর্শন মাকে। তারপর থেকে তাদের ব্যবহার বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল। মা ও গভর্ণরের বাড়ীতে সৌজন্য-সাক্ষাতে গেলেন। এর পরেই ডাইনিং রুমে একটি সঙ্গীতের জলসা হয়। প্রথম হল ঘরটির নামকরণ হ'ল সঙ্গীত - কক্ষ। সেখানে একটি পিয়ানো রাখা ছিল, অন্যধরণের কিছু বাজনাও ছিল। মা, গভর্ণরের স্ত্রী এঁরা সব উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্টি রুপে। দীলিপকুমার রায়ের কন্ঠ-সঙ্গীতও পরিবেশিত হয়েছিল।

এই ঘটনার পর গভর্ণর ও তাঁর স্ত্রী নিয়মিত মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসতেন- যদিও মা আর যাননি প্রথমবারের পর। পবিত্র ছিলেন মধ্যবর্তী মা ও গভর্ণরের মাঝখানে। এর পর নূতন গভর্ণর এলেন, রীতি হয়ে গেল এর পর থেকে নূতন গভর্ণররা প্রত্যেকেই মায়ের সঙ্গে দেখা করে যেতেন। একজন ছিলেন মায়ের ভাইএর অধীনস্থ পদে। কাজেই মায়ের প্রতি ছিল সকলেরই সম্ভ্রমপূর্ণ মনোভাব। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়টাই ছিল সবচেয়ে বেশী উদ্বেগ পূর্ণ। প্যারিসের পতনের পর আমরা চিন্তিত ছিলাম এখানকার ফরাসী সরকার Vichy (ভিকি) সরকারকে মেনে নেবেন কিনা- যারা শীর্ষে ছিলেন পেত্যাঁ। অথবা ডি-গ্যলের স্বধাধীন সরকারকে- যে সরকার তখন নির্বাসনে অবস্থান করছে। এই চিন্তায় পাড়ে আমরা বাইরে টাকা পাঠানো বন্ধ করলাম। যে স্বল্প -অর্থ আমাদের হাতে ছিল তা দৈনন্দিন খরচের জন্য সঞ্চিত রাখতে হ'ত। আমার প্রয়োজনীয় দ্রব্য - সামগ্রী গুছিয়ে ও জমিয়ে রাখতে শুরু করলাম। মাদ্রাজ থেকে পন্ডিচেরীতে ট্রেন চলাচল কখন বন্ধ হ'য়ে যায় সেই আশঙ্কায়। .

বহুবছর আগের কথা। পন্ডিচেরীতে তিনটি মাত্র মোটর গাড়ী ছিল। একটি গভর্ণর মহাশয়ের। একটি আশ্রমের ও আর একটি জনৈক শহরবাসী মুদালিয়রের।

আশ্রমের গাড়ীটি ছিল হলুদ রং এর। মাকে উপহার দেন এক ভদ্র-মহিলা - মাদম পোটেল। তিনি আশ্রমের প্রধান বাড়ীটির বিপরীত দিকেই থাকতেন। ঐ বাড়ীটিই এখন হ'ল Sri Aurobindo International Centre of Education -এর বাড়ী। মাদাম পোটেলের দুটি গাড়ী ছিল। দ্বিতীয়টি ছিল একটি সুন্দর লোরেন (Lorraine) গাড়ী। মা এটি পরে ওঁর কাছ থেকে ক্রয় করে নিয়েছিলেন কিন্তু গাড়ীটি তিনি কখনও ব্যবহার করেননি। মা হলুদ রং -এর গাড়ীটিতেই সাধারণত বেড়াতে বের হতেন। পবিত্রকে চালক হিসাবে সঙ্গে নিতেন। আরও একটি চালকও সঙ্গে থাকত - দ্বিতীয় হিসাবে। কোন কারণে গাড়ীর অচল অবস্হা হ'লে দ্বিতীয় জন পন্ডিচেরীতে মাইল কয়েক হেঁটে এসে আর একটি

গাড়ী নিয়ে ফিরে যাবেন ওঁদের ফিরিয়ে আনতে পন্ডিচেরীতে। শ্রীঅরবিন্দকে সেই সময়টুকু অত্যন্ত উদ্বিগ্নভাবে অপেক্ষা করতে হবে। আমরা সবাই রাস্তায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় থাকব। নির্জন-বাস ত্যাগ করে শ্রীঅরবিন্দ জানলার খড়খড়ি খুলবেন- খোলা ছাদে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করবেন মা ফিরলেন কিনা ? কেউ উওরে জানাবে হয়তো 'না'। আবার কিছুক্ষণ বাদে খড়খড়ি খুলে তিনি জিজ্ঞাসা করবেন 'মা ফিরে এসেছেন'? আমরা আবার বলব 'না'- তারপর দ্বিতীয় চালক পৌঁছে গাড়ী ভেঙে গেছে জানলে - অমৃত শহরে মুদালিয়ারের কাছে ব্যস্ত হ'য়ে গাড়ী চাইলেই মুদালিয়র ব্যস্ত হ'য়ে গাড়ী দেবেন মাকে ফিরিয়ে আনতে।

এরপর দুরাই-স্বামী একটি ছোট Renault গাড়ী ফ্রান্স থেকে আনলেন নিজের ব্যবহারের জন্য। কিন্তু সেটি নিজে না ব্যবহার করে মাকে উৎসর্গ করলেন। মা এখন তাঁর বর্হিগমনের জন্য ঐ গাড়ীটি ব্যবহার করতে শুরু করে দিলেন। কখনও অন্য আর একটি গাড়ীতে কাউকে কাউকে সঙ্গে করে বেরোতেন। যেমন নলিনী, অমৃত , দুরাইস্বামী - কখনও আবার আমিও সঙ্গে থাকতাম ওঁদের। যখন প্রেস তৈরী হয়ে গেল প্রথম দিকে কিছু সমস্যা দেখা দিল। সে কারণে মা ওখানে নিয়মিতভাবে যাওয়া আসা করতে চাইতেন। যে কোন কারণেই হ'ক ছোট Renault গাড়ীটি তিনি তখন ব্যবহার করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তাহলে কিভাবে যাতায়াত চলবে। জয়ন্তীলাল এগিয়ে এলেন। 'আমি আর একটি গাড়ী সংগহ করে দেব আপনাকে' মাকে জানালেন। মাদ্রাজে তাঁর বন্ধুর কাছ থেকে এক বিরাট গাড়ী নিয়ে হাজির হ'লেন পন্ডিচেরীতে। মা স্বচ্ছন্দে গাড়ীটি ব্যবহার করতে শুরু করলেন। দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের পর আমেরিকান কনসাল একবার মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ইচ্ছা প্রকাশ করে জানালেন মাকে। মা বলে পাঠালেন তাঁর পক্ষে নীচে নেমে দেখা করা সম্ভব হবে না। ব্যালকনিতে মা দাঁড়ালেন- আর কনসাল মহাশয় রাস্তায় -এই ভাবে তাঁদের সাক্ষাৎকার সম্পন্ন হ'ল। কাছেই দাঁড়ান ছিল বিরাট গাড়ী নীল রং এর ফর্ডো V-8 . মা ইচ্ছা প্রকাশ করলেন আমার যদি ঐরকম একটি বড় গাড়ী হয় তবে আমি বাইরে যেতে পারি। জয়ন্তীলাল তাঁর সাধ্য মত চেষ্টা করলেন। ঠিক তখনই দয়াভাইয়ের পত্র - লিখছেন তিনি পন্ডিচেরীতে আসছেন - পত্রের শেষ দিকে লিখলেন 'যদি কিছু প্রয়োজন হয় লেখ'- উনি নিজেই তা নিয়ে আসবেন। তৎক্ষণাত তাঁকে লিখে জানালাম আমাদের ১২০০০ এর মত টাকার দরকার একটি গাড়ীর জন্য। সঙ্গে সঙ্গে উনি টাকাটা পাঠিয়ে দিলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই ওঁর জন্য একটি V-8 নীল রং এর ফোর্ড গাড়ী সংগ্রহ করতে সমর্থ হ'লাম।

কিন্তু আমার ঠিক সন্তোষ হ'লনা এতে। মায়ের জন্য আমর মনে এল একটি Rolls Royce গাড়ীর কথা। একটা Catalogue ও সংগ্রহ করা গেল।

শঙ্কর গৌর আমাদের প্রিয় বন্ধু। একদিন ঘরে এলেন আমার। Catalogue টির উপর চোখ বোলালেন। আমরা স্হির করলাম একটি “Silver Queen Rolls Royce” মায়ের জন্য কেনা হবে। মাদ্রাজ থেকে কোম্পানীর Agent -কে ডাকা হ’ল এই উদ্দেশ্যে। ঐ গাড়ীর দাম তখন ৭৫,০০০ টাকা। Agent জিজ্ঞাসা করলেন “এই গাড়ী কেন “? এ গাড়ী শ্রচলার উপযুক্ত রাস্তা তৈরী হয়নি এখন ও এ দেশে , যদি কিছু ঘটে তবে সেটা ঠিক হবেনা”। আমি কথার মর্ম গ্রহণ করতে পারলাম, যুক্তি-সহ কথা মেনে নিতে হবে। সারা জীবন আমি এটা স্কীকার করছি যে আমাদের মাত্রাজ্ঞান রাখা দরকার। Agent একটি হাম্বার গাড়ীর মডেল দেখালেন Catalogue বইতে। ২৬,০০০০ হাজার টাকা দিয়ে আমরা গাড়ীটি কিনে নিলাম। মা ও তাঁর সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। ১৯৫২ পর্যন্ত মা গাড়ীটির সদ্ব্যবহার করেছেন।

নবজাতর সঙ্গে দ্বারভাঙ্গার রাজকুমারের বেশ বন্ধুত ছিল। তিনি খুবই ধনী। নবজাতর মাধ্যমে তিনটি গাড়ী পাঠালেন- তার থেকে একটি বেছে নেবার জন্য। ‘বেন্টলী’,’মার্সিডিস’ আর তৃতীয় গাড়ীটির নাম ঠিক মনে পডছে না। প্রথম দুটিই মা বেছে নিলেন। তৃতীয় গাড়ীটি ফেরত গেল। মা “মার্সিডিস” প্রায়ই ব্যবহার করতেন। গাড়ীটি এখনও আছে।

১৯৩৮ সালে শ্রীঅরবিন্দের ডান পায়ে আঘাত লাগার দূর্ঘটনার আগে আমরা তাঁর কার্পেটটি ব্রাস করে দিতাম - সেই সময়টুকুতে-যতক্ষন উনি স্নানের ঘরে থাকতেন। উনি শয্যাশায়ী হবার পর আমরা তুলো উডবে বলে আর ব্রাস করতে পারতামনা। মাদ্রাজ থেকে উদার একটি Vacuum cleaner যোগাড় করে আনলেন। কয়েক বছর থেকেই এটি উদার ঘর পরিস্কার করতেন। ওঁর হাঁটুতে একটা কষ্ট হবার পর থেকে আমি একাদিক্রমে পাঁচ বছর কাজটি করবার সুযোগ পেলাম। কিন্তু ওঁর দিকে কখনো তাকাবনা এই শর্তে। কাজেই এই পাঁচ বছরের মধ্যে শর্ত ভাঙাবার সুযোগ গ্রহণ করিনি।

একবার একটি ছুতোর-মৌমাছি শ্রীঅরবিন্দের ঘরের একটি বিম ফুটো করতে শুরু করে। ফলে শ্রীঅরবিন্দের বিছানার উপরে ধুলো ও ঘছাদের ভাঙা টুকরো গুলি পড়তে লাগল। মৌমাছিটিকে তাড়িয়ে বিমের ফুটোর মুখটি বন্ধ করে দিতে বললেন মা। শ

শ্রীঅরবিন্দ শুয়ে আছেন নিচে বিছানার উপরে- এই অবস্থায় আমাকে কাজটি শুরু করতে হচ্ছে। এ ভাবে কাজ করতে যাওয়া যেন চরম। পরীক্ষা আমার সামনে। যদি উপর থেকে কিছু পড়ে যায় ওঁর শরীরের উপরে-না ; এটা কল্পনা করাও সম্ভব নয় আমার পক্ষে। একটা পা-দানী লাগানো মই নিয়ে এলাম। প্রভুর বিছানায় একদিকে ওটাকে দাঁড় করালাম। Vacuum cleaner টিকে সবচেয়ে উপরের থাকে বসিয়ে দিলাম। নিচের

পাদানীতে দাঁড়িয়ে Vacuum cleaner এর সাহায্যে গর্তটাকে খালি করে দিলাম। ক্লিনারের মধ্যে পোকাটা পড়ে গেল। ধীরে ধীরে কটা লোহার পেরেক মেরে গর্ত্তর মুখটা এঁটে বন্ধ করে দিলাম। আমার জীবনের এই কাজটি কঠিনতম বলে মনে হয় আজ। কাজটি করবার সময় আমার সমগ্র সত্তা একলক্ষ্যে কেন্দ্রীভূত ছিল। পরিস্কার বুঝতে পেরেছিলাম মা আমার মধ্যে কাজটি সন্ধান করেছেন। কোন মানুষের পক্ষে এভাবে একাজ করা সম্ভব ছিলনা। একটুমাত্রায় স্নায়বিক দুর্বলতা-বা হাতের কাঁপুনিতে কাজটি পন্ড হ'তে পারত।

শ্রীঅরবিন্দের ঘরের ছাদে ফাটল ধরেছে কবে থেকে। এ বাড়ী বহু কালের পুরাণো। বছরে বছরে ছিদ্রের সংখ্যা ক্রমে বেড়ে চলেছে। শ্রীঅরবিন্দের ঘরের কড়ি-বর্গা বদলাবার জন্য হায়দ্রাবাদের এক শিষ্যকে তিনি হাজার দশেক টাকা দিয়ে রেখেছিলেন। বছর ঘুরে গেল কিন্তু কোন খবর এলনা। বারে বারে খবর পাঠান হ'ল কোন ফল হ'ল না। এমনি ভাবে তিন বছর কেটে গেল। ছাদ হয়ে দাঁড়াল চলুনী, সর্বত্র থালা বাটি ছডানো জল ধরবার জন্য- ডজন ডজন, একটি দুটি নয়।

১৯৪৬ সাল-ল আমার পক্ষে এ দৃশ্য অসনীয় হয়ে উঠল। একদিন বাজারের পথে আমার ভৃত্যটিকে জিজ্ঞাসা করলায়ম "শিবলিঙ্গম-কাড্ডালোরে একবার যেতে পার ? বিভিন্ন ধরনের শাল, সেগুণ প্রভৃতি কাঠের দাম ও মাপের খবর নিয়ে আসতে পারবে। তোমাকে আসা যাওয়ার ভাডা দেব।" শিবলিঙ্গম কাড্ডালোরে গিয়ে সব ভাল কাঠের দৈর্ঘ্য ও ঘের এর মাপ এবং দাম জেনে এল। মাকে তালিকাটি দিলাম। মা একজন আশ্রম এন্জিনীয়ারকে বললেন ওখানে গিয়ে কাঠ বেছে আনতে। "মা, উদার এবং জ্যোতিন্দ্র বলকেও সঙ্গে দাও যাতে মতের অমিল না হয়। তাঁরা গিয়ে তাঁদের পছন্দসই জিনিস সব বেছে রেখে এলেন। কাঠগুলি ব্যলকনি রোডের উপর দিয়ে আনা হ'ল। মা জানলার ভিতর দিয়ে সব দেখতে পেয়ে প্রসন্ন হলেন।

১৬ই আগস্ট - শ্রীঅরবিন্দকে আমরা উপরতলার ধ্যান-কক্ষে স্থানান্তরিত করলাম। ঘরের ছাদটি সম্পর্ণ নূতনভাবে তৈরী হয়ছে। ইলেকট্রিকের তারের লাইন বদলে দেওয়া হয়েছে। দেওয়ালগুলির চূণ বালি সিমেন্টর নতুন পলেস্তারা পডেছে। একটি নতুন কার্পেট মেঝেতে পাতা হয়েছে। ঘরের সমস্ত আসবাব তাঁর শোবার খাটশুদ্ধ নতুন করে বানানো হয়েছে। ২৩ শে নভেম্বর প্রভু তাঁর নতুন বানানো পুরানো ঘরে ফিরে এলেন।

ফরাসী গভর্ণর মঁশিয়ে ব্যারণ আশ্রমের অনেকের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। মা তাঁকে পন্ডিচেরীতে গভর্ণরের পদে রাখতে ইচ্ছুক ছিলেন। এবং তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তি এই উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করেন। তিনি যে কোন সময় মায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারতেন। মা আমাকে বলে দিয়েছিলেন "যেখানেই থাকি না কেন উনি এলে যদি স্নানে থাকি তবুও

টোকা দিয়ে আমাকে ডেকে দেবে।" এমন কি প্রণাম নেবার সময়ে এলেও মা প্রণাম স্থগিত করে ওঁর সঙ্গে দেখা করে আসতেন।

১৯৪৭ সনে Capitaine পন্ডিচেরী পুলিশের সর্বাধ্যক্ষ মাকে অনুরোধ জানালেন ১৪ই জুলাই "বাস্তিল দিবসের অনুষ্ঠানে আশ্রম অংশ গ্রহণ করুক। 'ব্যাস্টাইল' দিবস সেদিন। মা বললেন "আমরা অংশ গ্রহণ করলে গোলমাল হ'তে পারে"। অধ্যক্ষ মহাশয় জানালেন প্যারেডের সময় তিনি আশ্রম দলের সঙ্গে থাকবেন। মা তখন আশ্রমিকদের যোগদানে সম্মত হলেন। অনুষ্ঠান ভালভাবে উতরে গেল , কোন গোলমাল হ'ল না।

মাসখানেক পরেই পড়ল ১৫ ই আগস্ট- ১৯৪৭ শ্রীঅরবিন্দের ৭৫তম জন্মদিনের সঙ্গে মিলে গেল ভারতের স্বাধীনতা-দিবস। স্মরণীয় দিনটির উদযাপন আমরা যথাযোগ্য সমারোহের সমারোহের সঙ্গেই করব ঠিক করেছিলাম। কিন্তু যেভাবেই হ'ক সহরের বাসিন্দারা আমাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠল। কম্যুনিস্টরা সবসসময় আশ্রমের বিপক্ষেই ছিল। আবহাওয়া উৎকন্ঠায় ঘনিয়ে উঠল। সকলেই শঙ্কিত। এস্ত। শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রী মা স্বভাবতই এ বিষয়ে অবহিত ছিলেন। মূল আশ্রম বাড়ীর খোলা ছাদে সেদিন শ্রীমায়ের পতাকা উত্তোলিত হ'ল।

১৫ই আগস্ট প্রায় পাঁচটা বিকালে দর্শন শেষ হ'ল। আমরা সবাই স্বস্তির নিঃস্বাস ফেললাম। তেমন কিছু গোলযোগ হ'লনা। শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রী মা জিজ্ঞাসা করলেন- সব হয়ে গেল ?" 'হাঁ' শোনবার পর ওঁরা উঠে গেলেন। দর্শনের পর মা আমার ঘরের উপর খোলা ছাদে এসে দাঁড়াতেন। আর আমরা বসে থাকতাম নিচের আঙ্গিনায়। এবার আমরা ঠিক করলাম মা এলে 'জয় হিন্দ' ধ্বনি দিয়ে আমরা তাঁকে অভিবাদন করব। কিন্তু হঠাৎ আশ্রমের অঙ্গনে পাথর ছুঁড়তে লাগল কারা। আশ্রম গেট বন্ধ করে দেওয়া হ'ল তখনি। খবর পেলাম মূলশঙ্কর একজন সাধক ও শ্রীঅরবিন্দের সেবক- ঘাতকের হাতে ছোরার আঘাতে নিহত হয়েছেন। তাঁর দেহ আমার ঘরে এনে রাখা হ'ল- তারপরে হাসপাতালে, ডাক্তার বললেন 'অনেক দেরী হয়ে গেছে'।

আমরা পর পর চারদিনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলাম। ১৬ই ছিল মাল্য-বিতরণের দিন। কিন্তু এই বিয়োগান্ত ঘটনার পর অনুষ্টান কি আর চলবে ? তখন শাসনকর্তা ও পুলিশ-অধ্যক্ষ জানালেন "আমরা আসছি তোমাদের কর্মসূচী অব্যাহত রাখ। কেবল খেয়াল রাখতে হবে- একযায়গায় লোক জড়ো হ'য়ে ভীড না জমে। মালা বিতরণের কাজ চলছিল যখন- তখন ফরাসী বড় কর্তারা দুজনেই মায়ের পাশে শ্রএসে দাঁড়ালেন। অতবড় শোকাবহ ঘটনার পরেও ১৫ই আগস্টের উৎসব সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হ'ল। ১৯৫০ এর ৫ই ডিসেম্বর দেহ-রক্ষা করলেন। মা বললেন ওঁকে আমি আশ্রমের কেন্দ্রস্থলে রাখতে চাই - এক নিঃশ্বাসে আরো বলে গেলেন - "নিচের দিকে ১০ ফিট চলে

যাও-সেখান ওঁকে রাখ-চারপাশের দেয়ালগুলি ৫ফিট কর-তারপরে সেখানে বসাও পাথরের ফলক -তারপরে আবার ৫ফিট করে দেয়াল তোল-তার উপরে ফুল দেবার জন্য দ্বিতীয় একটা ফলক বসিয়ে দাও"। যখন তিনিও দেহত্যাগ করলেন- তখন একটি প্রস্তুত স্থান মিলল- আমাদের সকলকে আশ্বস্ত করে -এ প্রশ্নের কোন স্হান না দিয়ে - 'কোথায়'?

বহুবছর আগে ১৯৩০ সালে আশ্রমের ঘর-বাড়ী নির্মাণের কাজে তিনটি চৌবাচ্চা তৈরী করানো হয়েছিল- ইঁট ধোয়া ও চূণ বনাবার কাজে। কাজ শেষ হ'য়ে যাবার পরেই চৌবাচ্চাগুলি সরিয়ে দেওয়া যাক- আমাদের প্রস্তাব হ'ল। মা কিন্তু সম্মত হলেন না এ প্রস্তাবে। তিনি বললেন "ওগুলোকে ঢেকে দিয়ে ফার্ন লাগিয়ে দাও"। ঢেউ তোলা টিনের পাত দিয়ে চৌবাচ্চাগুলিকে ঢেকে ফার্ন গাছ বসিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু ফরাত্রিবেলায় ওগুলির উপর কিছু পড়লেই জোরে শব্দ হ'ত। আমরা আবার অনুমতি প্রার্থনা করলাম চৌবাচ্চাগুলি ভেঙ্গে দেবার জন্য। এবারেও তিনি ভাঙ্গাবার মত দিলেন না। বললেন 'টিনগুলি সরিয়ে দিয়ে ফার্ণের টবগলিকে কিছু টব উল্টে তার উপর বসিয়ে দাও'। সমাধির স্থান তখনই নির্দিষ্ট হয়ে গেল এই ভাবে।

শ্রী অরবিন্দ দেহ-ত্যাগের মা পরিস্কার ভাবে বলে দিলেন প্রথম ও দ্বিতীয় জলধারের মাঝের দেয়াল দুটি ভেঙ্গে দিয়ে দুটিকে একটিতে পরিণত করতে। তৃতীয়টি যেমন আছে থাক। তৃতীয়টি অর্থাৎ শেষটি একইভাবে আছে। এইটি পশ্চিমের সিঁড়ির দিকে পবিত্রর ঘর পর্যন্ত বিস্তৃত। তুলসী রাখবার স্হান ওটি। আধারগুলির আকৃতি একই রয়ে গেল। আমরা কেবল পলেস্তারা করে দিলাম গায়ে। কিন্তু সিমেন্টের গা ক্রমেই তৈলাক্ত হ'তে শুরু করল। নানারকম দাগ ধরতে লাগল সেই সাথে। কেউ কেউ বললেন "মার্বল দিয়ে ঢেকে দিলে ভাল হবে"। 6কেউ প্রস্তাব করলেন ওগুলির উপর ছাতার মত কিছু বানিয়ে ঢেকে দেওয়া যাক। মা বললেন "না-ওসব কিছু চাইনা। সাধারণ কয়েকটি ফুলদানীতে কিছু ফুল থাক খালি"। তিনি রূপার তৈরী কোন পুষ্পাধার রাখতেও প্রস্তুত নন। তবে মায়ের সম্মতিক্রমে প্রায় ২০ বছর পরে সেইগুলি মার্বল দিয়ে বাঁধানো হ'ল।

শ্রীঅরবিন্দের দেহরক্ষার কিছু পরে ফোটোগ্রাফার তাঁর ছবি নিলেন। এবং ৩০/৪০ টাকায় বিক্রী করতেও শুরু করলেন। সাধকদের মধ্যে অনেকেরই ছবি কিনবার টাকা নেই - তাঁরা এসে দঃখ প্রকাশ করতে লাগলেন। তাঁদের আশ্বস্ত করে বললাম - "ছবি পাবে"।

মায়ের কাছে গিয়ে সব বললাম। আমাদের নিজস্ব ফোটোগ্রাফাররা এবার ছবি তুললেন। ১২ ই ডিসেম্বর আমরা সকলকে শ্রীঅরবিন্দের ছবি দিলাম এক কপি করে। সকলেই স্বস্তির নিঃস্বাস ফেলে বাঁচলেন। তাঁর দেহবসানের সঙ্গে আমরাও যেন প্রাণহীন হয়ে পড়েছিলাম। আমাদের পক্ষে কল্পনা করা সম্ভব ছিলনা যে তিনি এভাবে একদিন চলে

যাবেন। ৫-১২ই ডিসেম্বর পর্যন্ত আমরা মাকে কেউ দেখতে পাইনি। ১২-মা উপরের ধ্যান-কক্ষে কিছুক্ষনের জন্য এলেন ফটোগুলি সবাইকে বিতরণ করতে। সেই আধো-অন্ধকার ঘরের মধ্যে তাঁকে একটু দেখতে পেয়ে আমাদের মধ্যে প্রাণ ফিরে এল। শ্রী অরবিন্দের মহা-সমাধির ছবিগুলি পেয়ে তাঁর সন্তানদের মধ্যে ভেঙ্গে পড়ার পরিবর্তে অনেকটা শক্তি সঞ্চারিত হ'ল।

১৯৪৭ সালের উৎসব-অনুষ্ঠানগুলি আমরা যথাযোগ্য প্রস্তুতি নিয়ে সম্পন্ন করতে চাইলাম। মাদ্রাজে বেসরকারীভাবে কয়েক বন্ধুকে আমি স্বাধীনতা দিবসের বাণীটি বেতারে প্রচারের জন্য লিখে পাঠালাম। সর্বভারতীয় বেতার থেকে লোক পাঠিয়ে বার্তাটি ঘোষণার জন্য গেল। ১৯২০ সালের পর থেকে শ্রীঅরবিন্দের কোন নতুন ছবি তোলা হয়নি। ১৯২০ এপ্রিলের পর মা এলেন। আমাদের কাছে তাঁর একটি মাত্র ফোটো ছিল জাপানের তোলা। ফোটো তোলায় তাঁর বিশেষ আপত্তি ছিল। একবার বালুভাই তাঁর ছবি তুলতে গিয়ে খুব তিরস্কৃত হলেন। ৩০ বছরের মধ্যে তাঁর কোন ছবি নেওয়া হয়নি। কিন্তু ভগবানের অভিপ্রায় বোঝা ভার। ১৯৫০ সালে ২৩ শে এপ্রিল, Life পাত্রিকায় Cartier Bresson এসে পৌঁছলেন। পবিত্রর মাধ্যমে তিনি মা ও শ্রীঅরবিন্দের ছবি তুলবার অনুমতি পেয়ে গেলেন। ২৩শে এপিল বেলা দুপুর ১.৩০ থেকে ২৪ শের দুপুর পর্যন্ত তিনি ৩০০ টি ছবি তুলে ফেললেন। শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দের সোফায়-বসা দর্শনের ছবিটি তাঁরই তোলা। এই ছবি নেয়ার অনুমতি যদি মা না দিতেন তবে দর্শনের কোন ছবি থাকত না আমাদের কাছে। ১৯২০ সালের পরেরও কোন ছবি থাকতনা শ্রীঅরবিন্দের।

কয়েকমাস পরেই ফোটোগ্রারফারটি মায়ের ছবি বিক্রী করতে শুরু করে দিলেন। 'নেগেটিভ'গুলি না দিয়ে তিনি বার্তা পাঠালেন- "আমাকে আগে ৬০০০ ডলার হাতে দিন অন্য হাতে নেগেটিভগুলি নিন"। আমার কথা "একটি দর্শনের ফোটোর জন্যই ওই টাকা দিতে আমি প্রস্তুত। কাঃ ব্রেসনকে ঐ টাকা পাঠিয়ে নেগেটিভগুলির উদ্ধার হ'ল।

আমাদের ছবি-তোলা দলের নেতৃত্বে প্রণব ও চিমনভাই ৪০টি অ্যালবাম তৈরী করে বিক্রী করলেন ১০০০ টাকায়। প্রতিটি অ্যালবাম এর প্রতিটি ছবিতে নম্বর দিয়ে মায়ের আশীর্বাদ নেওয়া হ'ল। শুধু দিব্য-করুণার সহায়তায় আমরা এই সব ছবিগুলি পেলাম। ৪০টি অ্যালবামেরও খুব চাহিদা দেখা গেল। তাই আমরা আরো ৫০০টি অ্যালবাম করে প্রতিটি ৫০০ টাকায় বিক্রী করতে পারলাম। এগুলিও মায়ের আশীবার্দ-পূত।

এক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলাম- এমন কারুর সন্ধান দিতে পার যিনি 'মুভি' তৈরী করতে পারেন ? 'হাঁ-আপনার বন্ধু কলকাতার অজিত। (সিলেন্স)মডকরলেন-নাম

দিলেন "শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম-চারটি অধ্যায়", আমি বম্বেতে ছবিটি 'ডেভেলপ' করে 'কমেন্টারী' যোগ করে দেবার জন্য পাঠালাম। যথেষ্ট টাকা খরচ হ'ল এর জন্য। কিন্তু এখানে সমলোচকরা ফিল্মটি পছন্দ করেননি- পরিবর্তন করবার পর তাঁরা ছাড়পত্র দিলেন। কিছু কপি প্রস্তুত করে বিক্রী করার পর খরচ উঠে গেল 'মুভির' .

ছবিটি বিভিন্ন কেন্দ্রে দেখানো হ'ল। একসময়ে কপিগুলি পুরানো ও জীর্ণ হয়ে পড়ল। তখন প্রনব- তেজবাবুর (ওড়িয়া ফিল্ম নির্মাণকারী ও অভিনেতা) সাহায্যে পুরানো কপির বিভিন্ন অংশ কেটে নিয়ে একটি নতুন ফিল্ম তৈরী করে ফেললেন। এই অমূল্য বিবরণীগুলি সংরক্ষিত করার জন্য আমরা এঁদের কাছে বিশেষভাবে ঋনী।

শ্রী অরবিন্দের দেহাবসানের পর আমি মারাত্মক কোষ্ঠবদ্ধতার কবলে পড়লাম। মা'কে বলার পর তিনি তাঁর শক্তি প্রয়োগ করলেন আমাকে দুর্ভোগ থেকে বাঁচাবার জন্য। কিন্তু কিছু হ'লনা। তখন কিছু ওষুধ দিলেন তাতেও কোন ফলোদয় হ'ল না। ডাঃ সত্যব্রত সেনকে আমার অবস্থা পরীক্ষা করতে বললেন। ভাল করে দেখবার পরেও দোষবহ কিছু পাওয়া গেল না। মা তখন বললেন শ্রী অরবিন্দের তিরোধানের প্রবল আঘাতের প্রতিক্রিয়া। ভিতরে সব শুকিয়ে গিয়েছে। ডাঃ সেন অবশ্য অন্য রকম সন্দেহ করেছিলেন - 'ক্যান্সার'। অনেককাল পরে একটি ছোটখাটো শারীরিক গোলযোগের জন্য তিনি আমাকে অস্ত্রোপচার করবার সময় অন্য দিক থেকেও পীরীক্ষা করলেন কিন্তু ক্যান্সার এর লক্ষন পেলেন না। মা ও সমস্তটা অনুসন্ধান করে আমাকে মুক্ত হ'তে সাহায্য করলেন।

ডাঃ ব্যাস আশ্রমের ছোটদের স্বাস্হ্য সংক্রান্ত পরীক্ষা - নীরিক্ষা করতেন। হঠাৎ কি মনে করে আমি তাঁর কাছে পরীক্ষা করাতে গেলাম। আংশিক ভাবে আমাকে কিছু না বলে উনি প্রণবকে বললেন মাকে জানাতে মাদ্রাজে কোন বিশযজ্ঞকে দিয়ে আমার গলাটা ভাল করে পরীক্ষা করাতে। ডাঃ সান্ন্যাল তখনি একজন বিশষজ্ঞের কাছে আমাকে দেখবার ব্যবস্থা করলেন। মা কে জিজ্ঞাসা করলাম "কেন মা এখানে থেকে কি গলাটা ঠিক হবেনা" ? "না মাদ্রাজে তোমার গলা পরীক্ষা করাতে চাই" মায়ের উওর সঙ্গে সঙ্গে। ডাক্তার পরীক্ষা করে ওষুধ দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন- "ওষুধ খাবেন ?" "হ্যাঁ-যা বলবেন করব" বললাম। "আপনাকে তিন সপ্তাহের জন্য কথা বন্ধ রাখতে হবে"- "কথা বলা বন্ধ রাখতে হবে" ফিরে বললেন। বললাম "আমার পক্ষে এটা খুব সহজ"। ডাক্তার সপ্তাহ খানেক পরে আমায় দেখা করবার নির্দেশ দিলেন। শুনলাম কাউকে আমার সম্বন্ধে মন্তব্য করলেন- "ব্যাপারটা বেশ গুরুতর"। ফিরে এসে মাকে সব কথা বললাম। মা একটা কাগজে লিখলেন " মৌনম" (Silence) "তিন সপ্তাহ"। যখন তাঁর সঙ্গে হিসাব নিয়ে বসতাম আমি তখনও কথা বলতাম না।

সাতদিন পরে আবার মাদ্রাজে গেলাম। পরীক্ষান্তে ডাক্তার আমাকে কথা বলতে বললেন- কিন্তু কথা এলনা মুখে। উনি ভাবলেন আমি ইচ্ছা করেই চুপ করে আছি। তিনি তখন বেশ জোরে বলে উঠলেন - "আমি ডাক্তার - আদেশ করছি কথা বলার জন্য'- আবার বেশ চেষ্টা করে নিচু গলায় অস্ফুট ভাবে বললাম। ডাক্তার বললেন - চার ভাগের তিন ভাগ ভাল হ'য়ে গেছে। কথা বলতে শুরু করুন এবার। ফিরে মাকে সব বললাম। ডাক্তারের অনুমতির পরেও মায়ের নির্দেশ রইল "আমরা আরো দুই সপ্তাহ 'মৌনম' অবলম্বন করে থাকব"। এর পর শীঘ্রই গলার কষ্ট মিটে গেল। আর কখনো অমন হয়নি। আর কখনো অমন হয়নি। এই ভাবে মা আমাকে শারীরিক ব্যাধি ইত্যাদির হাত থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করতেন এবং প্রতিবারেই শারীর চেতনায় সুস্থ থাকার জন্য যেন নতুন নতুন পথ খুলে যেত।

প্রথম দিকে আশ্রমের যাবতীয় সম্পত্তি-বাড়ী ঘর ইত্যাদি সব শ্রী অরবিন্দের নামে ছিল। কিন্তু তাঁর তিরোধানের পর যেহেতু মা ফরাসী নাগরিক এবং পন্ডিচেরী ফরাসী উপনিবেশ হবার ফলে মায়ের নামে সব সম্পত্তি হস্তান্তরিত হ'ল। আইনত সবই তাঁর নিজস্ব সম্পত্তিতে পরণত হ'ল। প্রতিটি জিনসের- খুব ছোট খাটো বস্তুর জন্যও তাঁকে স্বাক্ষর করতে হ'ল। ফরাসী আমলে সম্পত্তির উপর কোন কর ছিল না। যখন শ্রীমায়র নামে সম্পত্তি হস্তান্তরিত হ'য়ে গেল, মা তাঁর পুত্র শ্রী আঁদ্রেকে আশ্রম-সম্পত্তির উপর তাঁর কোন দাবি থাকবেনা এই মর্মে বিবৃতি দেবার জন্য লিখিতভাবে জানালেন। শ্রী আঁদ্রে তখনি তাঁর, এবং স্ত্রী ও দুটি কন্যা সন্তানের (জেনিন ও পুর্ণ, প্রেম) তরফ থেকে আশ্রম সম্পত্তি ও সম্পদ এর উপর সমস্ত দাবি পরিহার করে লিখিতভাবে বিবৃতি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

কিন্তু ভারতের সঙ্গে যুক্ত হবার পর সব অন্যরকম ব্যবস্থা হ'ল। ভারতীয় আইন অনুযায়ী মৃত্যুর পর ব্যক্তিগত সম্পত্তির অনেকটাই কর হিসাবে সরকারের প্রাপ্র। ১৯৫৪-৫৫ সালে শ্রী কে. এম. মুন্সী মাকে পরামর্শ দিলেন ভারতীয় সংবিধান মতে "তোমার এ সব এভাবে করা ঠিক হবে না। ভাল হবে একটি 'Trust' তৈরী করে নিলে।" উনি মাদ্রাজ ষ্টেটের মন্ত্রী শ্রী সুব্রম্বন্যমকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নেবেন কি ভাবে Trust তৈরী করতে তিনি সাহায্য করতে পারেন। চারজনকে নিয়ে মাকে সভানেত্রী করে Trust তৈরী হয়ে গেল। তিনি বেছে নিলেন নলিনী, অমৃত ও সত্যকর্মা সহ আমাকে। ডাঃ ইন্দ্রসেন তখনি আমাকে এসে জানালেন "তুমি একজন Trustee এখন"। আমি শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। মায়ের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম "মা তুমি কি আমাকে একজন Trustee করেছ"? - "কিন্তু আমাকে কেন-অনেকেই ত আছেন -আমি নামগুলি সব বললাম। আমি কর্মী মাত্র। কাজ করব তোমার।" তিনি শুধু বললেন "আমি তোমাকে

চাই", তখন বললাম "হ্যাঁ মা।" Trust এর দলিল তৈরী হয়ে গেল - দুই দিনে Trust তৈরীর কাজ শেষ। প্রথম দিনেই তিনি আমাদের সকলের হাতে দিলেন ফুল- 'Divine Love' .দ্বিতীয় দিনেও আমাদের হাতে আবার ফুল দিয়ে আশীবার্দ করলেন। এ ফুলের মমার্থ 'বিএশ্বস্ততা'।

আশ্চর্য ব্যাপার এই -যে ১৯৫৪-৫৫ সালে মুন্সী Trust সম্পর্কে এই পরামর্শ দিয়েছিলেন ; সম্প্রতি মায়ের একটি নোটবুকে পেলাম ১৯৫১ সালেই মাকে সভা-নেত্রী রেখে আরো ৪ জনকে নিয়ে একটি Trust গঠনের প্রস্তাব নোট করা আছে। একটা ছোট খাতায় মা প্রয়োজনীয় সব কিছুই নোট করে রাখতেন। তখন Trust সম্বন্ধে কোন পরিকল্পনা ছিল না।

আমাদের ভিতর বাহিরের সব কিছুই জানতেন। মা যতদিন দেহে ছিলেন ততদিন এটা একটা নিয়মগত ব্যাপার ছিল। Trust-Deed-এ পরিস্কারভাবে বলা আছে-Trustee-দের কেউ একজন দেহত্যাগ করলে অবশিষ্টরা সেই স্থানে আর একজনকে তাঁদের মধ্যে গ্রহণ করবে। প্রথমে চলে গেলেন অমৃত, তাঁর স্থানে 'কুনুমা' এলেন। কুনুমা আইন-বিদ্। যখন আমাদের আইনের পরামর্শ দরকার হত অমৃত কুনুমার সাহায্য নিতেন। তাঁরা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন এই সূত্রে। যখন মায়ের কাছে আইনের বিষয় নিয়ে আলোচনায় যেতে হ'ত অমৃত কুনুমাকে সঙ্গে করে মায়ের কাছে নিয়ে যেতেন। অমৃত কোন কারণে আদালতে অনুপস্থিত থাকলে তাঁর পরবর্তে কুনুমা কাজ চালিয়ে নিতেন। যখন অমৃত লোকান্তরিত হলেন তাঁর স্থান কুনুমা পূর্ণ করলেন Managing Trustee হিসাবে। মা নিয়ম করে দিলেন নবাগতর সিদ্ধান্ত আলোচনা অন্তে স্বীকার করে নেওয়া হবে। প্রস্তাবটিতে আমরা সবাই স্বাক্ষর করলাম। কখনো মতভেদ হ'লেও সর্বদাই তাঁর মতামত মেনে চলতাম।

তারপর চলে গেলেন সত্য-কর্মা। কয়েক মাস ধরে তাঁর শূন্যস্থান পূর্ণ হ'লনা। মা তখন নিজেই প্রস্তাব দিলেন আমাদের পাঁচজন হ'তে হবে। সত্য-কর্মা যাবার পর শূন্যস্থানটি গ্রহণ করতে 'প্রদ্যোত্ক যদি বলা যায়-কেমন হয় ? অবশ্যই আমরা এ বিষয়ে একমত হলাম- মা কে জনালাম "তোমার যাকে ইচ্ছা গ্রহণ করো"। প্রদ্যোত ই নির্বাচত হলেন এইভাবে। যদিও তিনি তখন কলকাতায়।

তারপর তো মা নিজেই চলে গেলেন। আমাদের সামনে বিরাট প্রশ্ন "-কাকে নেওয়া যাবে ? " কোন মীমাংসা হ'লনা এ প্রশ্নের, বছর ঘুরে এল। '৭৪ সালের ১৭/১৮ তারিখ নাগাদ আমাদের মনে হ'ল হরিকান্তের কথা। হরিকান্ত ছিলেন Prosperity-র দায়িত্বে দীর্ঘদিন থেকে। তাকে সকলেই চিনতেন।

যখন নলিনী চলে গেলেন- জানা গেল তিনি মনোজকে মনোনীত করে গেছেন। অবশ্যই আমরা সকলকে মিলিতভাবে তাঁর ইচ্ছা মেনে নিলাম। এরপর 'প্রদ্যোত'-এর শূন্যস্থানে আমরা 'পারু'কে মনোনীত করলাম, এই ভাবে নিয়মটি আজও চলে আসছে।

গোঁড়ায় আশ্রমের পক্ষে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাবার কোন প্রশ্ন ছিল না। যাঁরা শ্রী অরবিন্দের আদর্শ উপলব্দি করেছেন - তাদেরই উপর ছিল আমাদের একান্ত ভরসা। আশ্রমের বেতনভুক্ত কর্মীরা এরপর বর্ধিত হারে বেতন দাবি করতে শুরু করল। যে হারে বেতন দেওয়া হ'ত তাতে চাদিয়া মিটছিলনা, তখন কথা হ'ল শুধু বেতনের হার না বাড়িয়ে এমন সব বিক্রয় সংস্থার ব্যবস্থা হ'লে ভাল হয় যেখানে কর্মীরা ন্যায্য মূল্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী পেতে পারেন। তাছাড়া ঐ ধরনের বিক্রয়-কেন্দ্র থেকে আশ্রমের আয়ও অনেক বৃদ্ধিপাবে-লাখ খানেক হ'তে পারে তা। মায়ের মনঃপূত হ'ল প্রস্তাবটি। ১৯৫০ সালে বম্বের একটি বাণিজ্যিক সংস্থা- Eastern Trading Co নামে পন্ডিচেরীতে অবস্হিত ছিল। তারা সেটা বন্ধ করে দিল। মা বিপনটি ভান্ডার সমেত কিনে নিলেন। তারপরে বম্বেটে দয়াভাইকে টেলিগ্রামে জানিয়ে দিলেন যাতে তিনি এসে ঐ বিক্রয়-কেন্দ্রের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই ভাবে প্রবর্তন হ'ল Honesty Society র। মা এই ধরণের ব্যবসায়িক প্রচেষ্টার পিছনে সামগ্রিক ও সম্পূর্ণ ভার নিয়ে দাডালেন। এর উদ্বোধন - অনুষ্ঠানে মা স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। পরিচালনার বিষয়ে বিস্তারিতভাবে সব বুঝিয়ে দিলেন। কত লাভ থাকবে - কিভাবে কোন কাজ সম্পন্ন করতে হবে তার পথ নির্দেশ দিলেন নিখুঁত ভাবে।

তারপরে আরো কিছু এ ধরণের উদ্যোগ নেওয়া হ'ল-তবে সব সফল হল'না। দয়াভাই অবশ্য তাঁর পরিচালনার কাজ সুষ্ঠভাবে এগিয়ে নিয়ে চললেন। পতিষ্ঠানের সন্চিত পূঁজি ছাড়া মা দয়াভাইকে Registration ও অন্যন্য কাজের জন্য নগদ ১৫,০০০ হাজার টাকা দান করলেন। ধীর স্থির ভাবে তাঁর প্রতিষ্ঠানটি তিনি গড়ে তুললেন। তাঁর নিজের জন্য তিনি কিছু নিতেন না, ব্যবসার পুরো লভ্যাংশটি তিনি আশ্রমকে দিয়ে দিতেন। Honesty Society থেকে ও তিনি একটি পয়সাও কখনও নেননি।

পরে Honesty র কাজ দুই ভাগে চলতে লাগল। পাইকারী (wholesale)ও খুচরা বিক্রয়ের বিক্রয় ব্যবস্থা হ'ল। দয়াভাই পাইকারী বিক্রয় ভাগে ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত সেখানেই কাজ করে যান। Honesty Society পন্ডিচেরীর মানুষকে এখন পর্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে সেবা করেছে। দুইবার পন্ডিচেরীর মানুষের জীবন-যাত্রা র্দুভিক্ষের দরজায় গিয়ে ঠেকেছে। পন্ডিচেরী সরকার Honesty -কে দায়িত্ব অর্পণ করে ন্যায্য দামে সমস্ত অধিবাসীদের চালের সরবরাহ দিতে। দয়াভাই এই বিরাট দায়িত্ব অতি সুষ্টু ভাবে পালন করে তাঁর যোগ্যতার প্রমাণ দেন।

মা মানবজীবনের সর্বাঙ্গীণ দায়িত্ব দিয়ে তার রূপান্তর আনতে সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। তিনি এ বিষয়ে এতদূর এগিয়ে চিন্তা করতেন যে আমাদের L. Assembly ও Municipal Corporation -এর প্রার্থী হিসাবে দাঁড় করানোর কথাও ভেবেছিলেন। কেউ অবশ্যই অতটা এগিয়ে না গেলেও- আমরা আমাদের ভোটের সদ্ব্যবহার অবশ্যই করতাম।

প্রথম প্রথম কাঠের কাজের, লোহার কাজের বিভিন্ন বিভাগগুলি গৃহ নির্মাণ বিভাগের সাহায্যের কাজ চালাতো। শেষদিকে এগুলি সব বিভিন্ন ব্যবসায়িক বিভগের আকার প্রাপ্ত হ'য়। মা তখন এগুলির জন্য একটি স্বতন্ত্র Trust-এর পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। প্রয়োজন হ'লে এই ডিপার্টমেন্টগুলি ব্যবসা চালাবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ঋণ নিতে পারবে।

এমনিতে মা আশ্রম Trust-এর কাছে কোন ঋণ নেবার পক্ষপাতি ছিলেন না (ঋণ নেওয়ার বিপক্ষেই ছিলেন)। একবার Lake Estate-এ ১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকার একটি বিরাট পরিকল্পনার উদ্যোগ নেওয়া হয়। প্রথমে মনে হয়েছিল গভর্ণমেন্ট ঐ টাকার অঙ্কটি সাহায্য হিসাবে দিয়ে দেবে। পরে বোঝা গেল ১৫ লক্ষ টাকা তাঁরা মন্জুর করবে grant (দান) হসাবে। বাকী ১৫ লক্ষ টাকা দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ হিসাবে নামমাত্র - ৫ % সুদের উপর। প্রথমে মা রাজী হ'য়ে গেলেন এই প্রস্তাবে। কিন্তু যখন জানালেন আমাদের কিছু সম্পত্তি বন্ধক রাখতে হবে এই কারণে তখন তিনি ঐ ঋণ প্রত্যাখ্যান করলেন। এ সময়ে একজন উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারী ৭ লক্ষ টাকার চেক নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন - আমাদের বোঝাতে যে উপরোক্ত সুবিধাজনক প্রস্তাবটি যেন না হয়।

অন্যান্য Trust গুলো সম্বন্ধে অন্য কাহিনী। তারা 'লোন' (Loan) 'Overdraft' সবই নিতে পারত। মা এদের কাজে-কর্মে খুব উৎসাহ দিতেন। সত্যি বলতে কি এই অর্থ উপার্জনকারী বিভাগগুলি না থাকলে আশ্রম চালানো খুবই দুস্কর হ'ত আমাদের পক্ষে। এদের সাহায্য ছাড়া আমরা কিছুই করতে পারতাম না-যা আমরা করেছি তার সামান্য ভাগও। ফরাসীরা পন্ডিচেরী ছাড়বার আগেই কিছু ফরাসী তামিল লোকেরা শহর ছাড়তে শুরু করল। অনেক বাড়ী এমনি ভাবে ফাঁকা হয়ে গেল। সেই বিরাট হল ঘরটিতে-যেটা এখন ডাইনিং হল এক ঘী ব্যবসায়ী ঘী তৈরী করত। ইত্যবসরে আমরা বাড়ীগুলি ভাড়া নিতে শুরু করলাম ১৯৩৪ পর্যন্ত ডাইনিং রুম আশ্রমের মূল বাড়ীতেই অবস্থিত ছিল। ১৯৩৪এর ৪ঠা জানুয়ারী আমরা ওখান থেকে 'Aoume'তে যাই যেটা এখন ডাইনিং হল বাড়ী। অধিকাংশ সাউযাই তখন ভাড়া বাড়ীতে বসবাস শুরু করেন। ভাড়াও আস্তে ২/৩ গুন বেড়ে গেল, তখন আমরা সাধ্যমত খরচে নিজেদের বাড়ী তৈরী করতে শুরু করলাম।

১৯৬০ এর ২৯শে ফেব্রুয়ারী -পৃথিবী অতিমানস আলোকে অবতরণের প্রথম লিপ্-ইয়ার পুণরাবর্ত্তনের বছর। আশ্রমের পরিমন্ডলটিকে সুবর্ণময় করে তুলতে চাইলাম আমি। যদি কেউ - মাত্র একজনও ঐ পরিবেশে বা আবহাওয়া থেকে একটি স্পন্দনও গ্রহণ করতে পারে তবে আমি সত্যি সুখী হবো।

সত্যি উপরে ও নীচে সবই হ'য়ে উঠল যেন স্বর্ণময়। মায়ের ঘরে সোনালী সার্টিনের আস্তরণ বিছিয়ে দিলাম। তিনি তার উপর দিয়ে হেঁটে 'ব্যালকনি'তে এলেন দর্শন দিতে। তাঁর কোটের বোতাম, চামর, কাঁটা, কাপ ও সমার সব কিছু সেদিন ধারন করছিল স্বর্ন-বর্ন। জাপান ও ইংলন্ড থেকে সমস্ত খাবার বাসনগুলি এল সোনালী রং এর উপর সোনালী প্রতীক বহন করে।

মা জিজ্ঞাসা করলেন "এসব করছ কেন?" "মা একটি স্বর্ণময় আবহাওয়া সৃষ্টি হবে -যদি একটি মানুষ তার স্পন্দন ধরতে পারে আমি বড়

খুশী হবো"- বললাম মাকে। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন- "পরে যদি এসব আমি বিক্রি করে দিতে বলি?" "হাঁ-মা আমি তাই করবো- তাই করব"- উত্তর দিলাম তাকে।

সোনালী পাতে মোড়া শ্রীমা শ্রীঅরবিন্দের প্রতীকগুলি সমস্ত আশ্রমিক ও ভক্তদের নিজের হাতে করে দিলেন। একটি সর্ত্ত করলেন। "প্রতীকগুলি তাঁদের হাতে দেব কেবল যারা এখানে এসেছে। এই উপলক্ষে এসেও যারা দর্শন পায়নি যে কোন হ'ক-ক অনেক কাকুতি -মিনতি করা সত্ত্বও মা তাদের প্রতীক দেননি। প্রতীকগুলি মায়ের ঘরে ২৯ শে পর্যন্ত রাখা ছিল। মা বললেন "দ্যুমন এখানে এগুলি চোরদের প্রলোভিত করবে।" "আচ্ছা, মা- আমি কাছে পিঠে কোথাও থাকব রাত্রে।" উওর দলাম মাকে। সেই থেকে ২৫ বছর একাদিক্রমে মায়ের ঘরের করিডরে একটি মাত্র মাদুর ও বালিস নিয়ে শুতাম। খুব সম্প্রতি ওখানে শোয়া বন্ধ করেছি - শারীরিক অসুবিধার জন্য।

উৎসবের এই সব সাজ - সজ্জা প্রস্তুত যথার্থ কঠিন কাজ ছিল। বন্ধুদের বললাম সকলকে ডেকে-এই কাজে লাগবে তা পুরোপুরি ভাবেই দিতে হবে। আরো কথা-ডাইনিং রুমে আহার্যও তৈরী হ'ল সেদিন স্বর্ণচ্ছটা ছড়িয়ে। (স্বর্ণ-দিবসের সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়ে গেল দ্বিতীয় বারের উৎসবের দিনেই)

একদিন - মায়ের শরীর ভাল নয়। তবুও খেলার মাঠে গেলেন। যখন ফিরে এলেন - ক্লান্তভাবে বললেন "দুম্যন আমায় একটা বালিশ দাও-একটা বালিশ দাও, আমি সোজা শুয়ে পড়তে চাই।" তিনি তাঁর বিশ্রাম-কক্ষে গিয়ে শুয়ে পড়লেন - আধঘন্টা মত বিশ্রাম নিয়েই উঠে পড়লেন।

আমার তখন চিন্তা হল- দিনের বেলায় এমন হলে কি হবে। তাঁর একটা আলাদা থাকবার মত উপযুক্ত ঘর নেই। দিনের বেলায় তাঁর ঘরে অনবরত লোকের আসা যাওয়া চলে। আমি যেন দিশাহারা বোধ করতে লাগলাম। পরদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম যদি দিনের বেলায় তোমার এরকম হয় তাহ'লে কি হবে ? " মা তোমার নিজস্ব একটি ঘর থাকলে ভাল হয় না?"

সে সময় একটা পরিকল্পনা ছিল পুরণী যে ঘরে বাস করতেন তার একটা পাশ ভেঙ্গে নূতন একটা ঘর তৈরী হবে মায়ের জন্য। "না না আমাকে ওটা দিওনা"। মা কে বললাম - এতে আশ্রমের উপর কোন চাপ পড়বে না। বাইরে থেকে টাকাটা সংগ্রহ করব আমি। "আচ্ছা তাহ'লে এটার উপরই আমাকে একটা ছোট ঘর করে দাও।"

নবজতক বললাম - উনি ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলেন আমার - লাখ খানেক টাকার দরকার হবে মায়ের ঘর তৈরী করতে। মাকে উনি সোজাসুজি টাকাটা পাঠিয়ে দিলেন। মা আমায় জানালেন - "টাকাটা পেয়েছি।" মা টাকাটা কোষাধ্যক্ষের হাতে দেব না আমি' বললাম তাঁকে - 'কারণ এযদি কোষাধ্যক্ষর হাত থেকে টাকাটা নিয়ে তোমার ঘর বানাই তাহ'লে কথা হবে

ঐ দেখ শ্রীঅরবিন্দ নেই উনি এখন বেশ নিজের ঘর বানাতে শুরু করেছেন- আমি এ সব কথা শুনতে চাইনা। নবজাতর কাজ থেকে "মাটাকাটা এই জন্যই নেওয়া হ'য়েছে- টাকাটা আমি রাখব। বিলগুলি সরাসরি শোধ করব। ঘরটি হয়ে গেলে বলতে পারব 'ঘরটি মাকে উৎসর্গ কবা হ'য়েছে।"

শ্যামকুমারী বলছেন, এইখানে প্রশ্ন করলাম "দ্যুমন ভাই মায়ের সম্বন্ধে এই সব হীন উক্তি করত লোকেরা ?" উওরে তিনি বললেন "হ্যাঁ এরকম মানুষদের আমি জানি। ১৯২৬ সালে তারা বলতে শুরু করল - কে এই মা ? শ্রীমতী আলফাসা কি দিব্য-জননী ? শ্রী অরবিন্দ উওরে বলেছিলেন 'হ্যা'। শ্রী অরবিন্দ দেহ-ত্যাগ করলেন যখন তখনই কিছু লোক আবার গুন্জন তুলল-। এর উওরে 'The Mother' গ্রন্থের ২ হাজার ১ শত কপি ছাপা হ'ল। প্রত্যেক কপিতে সংখ্যা উল্লেখ করে মায়ের স্বাক্ষর নেওয়া হ'ল। ১০ টাকা মূল্যে প্রতিকপি বিক্রী হ'ল। তবু কিছু কিছু কথা উঠতে থাকল। তখন আমরা শ্রী অরবিন্দের মূল লেখার কপি নিয়ে ১০০ কপি ছাপালাম বিক্রীর জন্য। এইগুলি বিতরণের ফলে দৈবসংযোগ ঘটে গেল যেন। নানা কথা ও গল্পের বুদবুদ মিলিয়ে গেল।"

নতুন ঘরটি সম্পূর্ণভাবে তাঁর নিজস্ব ব্যবহারের জন্য তৈরী হল। তিনি যাতে সেখানে খানিকটা অন্তরালে ও একা কাটাতে পারেন। কিন্তু এমন তাঁর অভ্যাস যেখানেই তিনি সেখানেই ভীড়- যায়গাটি হ'য়ে ওঠে সর্ব-সাধারণের। প্রথম দিকে তিনি তাঁর ঘরেই থাকতেন একা। জকিছু পরে ১৯৬২ থেকেই-সঠিক বলতে গেলে - দিনান্তে যখন তিনি

বিশ্রাম নিতেন বা যখন থেকে ঘরে থাকাই শুরু করলেন তাঁর ঘরটি হয়ে উঠল সকলের ঘর। অন্তরাল বলে আর কিছু রইল না। তখন মা আরো একটা ছোট ঘর চাইলেন। সাদা ধবধবে কার্পেটটি তাঁকে যখন ব্যবহারের জন্য দেওয়া হয় (এখন যেটি ধ্যান ঘরে পাতা থাকে) তখন বললেন 'দ্যুমন আমার নতুন ঘরের জন্য এটি রাখ' কিন্তু নতুন ঘর আর হ'ল না।

অনেকবার মা আমাকে বলেছেন - "প্রতিজ্ঞা কর তুমি আর নতুন কোন কাজ ধরবে না। যদি কাজ করতে হয় তবে সে কাজ তুমি নেবে আমার কাছ থেকে" - "প্রতিজ্ঞা করে বল" তুমি যখন কোন কাজ নাও তার মধ্যে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়।" "হ্যাঁ মা" কিন্তু এর পরেই যখন অনিল ভট্টাচার্যের কাছে শুনলাম-একটি বিরাট আয়তনের জমির কথা-এখন যেটি gloria বিক্রীর অপেক্ষায় রয়েছে তখনই তাকে সেটি কিনে ফেলতে বললাম। "জমির মালিক যে দাম দিয়েই জমিটা রাখ এক পয়সাও কম নয়।" আমি টাকাটার ব্যবস্থা করলাম বাইরের থেকে। মা এ সম্বন্ধে তখনি অবহিত হ'লেন যখন তাঁকে কাগজে সই দিতে হ'ল।

"গ্লোরিয়া"তে আমরা যোগের একটি নতুন অধ্যায় শুরু করলাম। জড়ের মধ্যে যোগ নিয়ে আমাদের কাজ চলতে লাগল। এখানে আমরা গাছ-পালার স্বাস্থ্যের জন্য কোন রাসায়নিক সার ব্যবহার করিনা। পোকা-মাকড় মারবার ওষুধ ও নয়। মা আমাকে এ বিষয়ে প্রথমেই সচেতন করে দিয়েছিলেন - "আশা করি তুমি এই সব জিনিস ব্যবহার করবে না।" "না-মা করবনা"- ছিল আমার উওর।

শ্রী অরবিন্দের ডান পায়ে আঘাত পাবার পর ডাঃ মণিলাল ও"কে টমাটোর সুরুয়া খাবার বিধি দেন। আমরা ও"কে ঐ জিনিসটি দিতে চাইলাম কিন্তু উনি অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন। মা জিজ্ঞাসা করলেন "আমি একটু চেষ্টা করি ?" "হ্যাঁ মা" আমরা বললাম তাঁকে। তখন আমরা টাটকা বাঙ্গালোর বা নীলগিরি থেকে সংগ্রহ করতাম। দুই দশক হ'য়ে গেছে তাঁকে টাটকা টমাটোর সুরায়া করে খাইয়েছি নিয়ম করে ১৯৭১ হবে বোধ হয় - মা একদিন বললেন "দ্যুমন বাঙ্গালোর টমেটোর সুরায়া খেয়ে মনে হয় - ওরা ওখানে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ওষধ ব্যবহার করে।" 'হ্যাঁ মা' . "তাহ'লে এ জিনিস আমার স্বাস্থ্যের পক্ষে ঠিক হবে না-তাই না ? - তাহ'লে ঐ জিনিস আমাকে আর একদম দিওনা।" 'ঠিক আছে মা'- তাঁকে বললাম। 'মা গ্লোরিয়াত কিছু টমাটোর চাষ করি আমরা তাতে কেমিকাল সার বা কীট নাশক দেওয়া হয় না'। আমি ওখান থেকে কিছু নমুনা এনে তোমায় দেব। যদি তোমার তা পছন্দ হয় - সেটা টমেটো থেকে সুরুয়া হবে।' আমি গ্লোরিয়া থেকে কিছু টমেটো এনে মাকে দেখালাম। দেখে খুশী হলেন এবং টমেটোর সুরায়া আবার শুরু করলেন।

যা তাঁর স্বাস্থ্যের পক্ষে উপাদেয় মনে করতাম তাঁকে তাই দিতে চেষ্টা করতাম। মনে হ'ত তাঁর শরীর রক্ষার জন্য যা ভাল তা বিশ্ব-জনীন দেহের পক্ষেও ভাল। তাঁরও বিশ্ব-জনীন শরীর এক। এই ভাব থেকেই আমরা এই খামার বাড়ীটি (গ্লোরিয়া) প্রতিষ্ঠা করেছিলাম উদ্যোগী হ'য়ে। সারা পৃথিবীর মানুষ গ্লোরায়া দখতে এসেছে - কত Seminar অনুষ্ঠিত হ'য়েছে ওখানে। ৩০ বছর কেটে গেছে এই খামার বাড়ীর পজন্মের পর। জড়ের ভিতর প্রকাশিত হবে চেতনা এবং তার প্রথম শর্তই হল একটি শান্তিময়, সহদয়তা ও সঙ্গতিপূর্ণ পরিবেশ মন্ডিত কোন স্হান। গ্লোরিয়া ও আমার মধ্যে আশ্চর্যজনক ভাবে এই বিশেষত্বটি বর্তমান। আমি ১০০ "বেগনফুলি" জাতের আম গাছ রোপণ করেছি এর মাটিতে। প্রতি বছর আমের মরশুমে প্রতিটি আশ্রমবাসী যাতে একদিন আম ও খেতে পায়। এখন অনেকগুলি গাছের আম 'ফলছে। ১৯৮৯ সালে ডাইনিং হলে প্রত্যেককে আম দেওয়া হয়েছিল।

অল্পবয়সে মা যথেষ্ট পরিমাণে দুধ গ্রহণ করতেন শুনেছি। কিন্তু এখানে আসবার পর খেতেন না - অন্তত কয়েক বছর তো নয়। প

একদিন যখন আমি তাঁর জন্য ফলের রস করে নিয়ে যাই সঙ্গে তখন কিছুটা দুধও নিলাম। আশা করেছিলাম মা হয়ত একটু দুধও খেতে পারেন ঐ সঙ্গে। আমাকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন 'ওটা কি' ? বললাম 'দুধ'। "তাহ'লে এর মধ্যে কিছুটা দিয়ে দাও।" আবার এই ভাবে তিনি দুধ শুরু করলেন।

প্রথম কমলার রস খেতেন। আমরা Lake Estate -এ কিছু কমলা লেবুর গাছ লাগিয়ে দিলাম। পরে একদিন ঐ গাছগুলির ফল থেকে আমি মায়ের জন্য রস তৈরী করে নিলাম। খেয়ে মা জিজ্ঞাসা করলেন "চিনি দিয়েছ ?" 'না মা' - বললাম উওরে। "কিন্তু এত মিষ্ঠি !" খুশি এ চলতে হ'ত বিশেষত খাবার তৈলাক্ত না হয় কোন মতে।

মায়ের খাবারের কথা বলতে গিয়ে আরো কত গল্পই মনে পাড়ে যাচ্ছে। প্রায় বছর ৫০ আগের কথা। বেলা ৩-৩০ টার সময় মধ্যাহ্ন ভোজনে বসেছেন। নলিনী কিম্বা অমৃত মাকে জানালেন 'স' তার খাবার খাচ্ছেনা ঠিক করে। মা খোঁজ করলেন 'কেন ?' উওরে বলতেই হ'ল খাবারে নাকি আলু পাচ্ছে না। মা আমাকে ওখান দিয়ে যেতে দেখে ডাকলেন 'দ্যুমন ! আমার থালায় অনেক আলু রয়েছে দেখ- 'স' কে দিয়ে দেবে ? -তাকে দেওয়া দরকার' মা ফিরে আবার বললেন। আমি বললাম 'হ্যাঁ মা।'

এখানে আলুর আরো গল্প ! দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ তখন তুঙ্গে। সরকার সৈন্যদের জন্য সমস্ত আলু টেনে নিচ্ছে। ১ কিলো আলু ও বাজারে পাবার কোন উপায় নেই। যদিও মায়ের আলুর চাহিদা ছিল না খাবারে-এবং খাবার বিষয়ে কোন কিছুর প্রতি এতটুকু টান ছিলনা তথাপি আমি তাঁর জন্য কিছু আলু সংগ্রহ করে রাখব ভাবলাম। তাই যুদ্ধের সময়

মিশর দেশ থেকে আলু আমদানী করতাম। ৬ পয়সার বদলে ১ টাকা করে কিলো কিনতাম।

মায়ের স্যালাড প্রস্তুত করতে তখন অলিভ তেল দরকার হ'ত। যুদ্ধকালীন ভারতবর্ষে তখন এ জিনিস মিলতনা। শুনলাম সিঙ্গাপুরে ও জিনিস পাওয়া যায় আমরা একটা ৩০০ Kgর তেলের পিপে আমদানী করলাম। তারপর কতকগুলি নির্বীজিত বোতলে ড্রাম থেকে তেল বের করে ভরে নিয়ে সেগুলিকে সোনালী তবক দেওয়া কাগজে জড়িয়ে নিয়ে বাস্কের ভিতর মুড়ে রাখলাম। পবিত্রর প্রয়োজন হলেই তাকে আমরা বাস্ক থেকে অলিভ তেল বের করে দিতাম।

শ্রীঅরবিন্দ পছন্দ করতেন আঙ্গুরের রস। কিন্তু এ জিনিস ভারতে অমিল। যুদ্ধের সময়ও আমরা পারলেই মিশর, দক্ষিণ-আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া থেকে আঙ্গুর সংগ্রহ করতাম।

একসময়ে মা টাটকা আঙ্গুর খুব পছন্দ করতেন। তখন ১Kgর দাম ছিল মাত্র ৫০ পয়সা। আমরা বীজশূন্য আঙ্গুর আনাতাম চমন, আফগানিস্তান প্রভৃতি যায়গা থেকে। শুনেছিলাম ওই সব স্থানের আঙ্গুরই নাকি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতের। কিন্তু সারা বছরের জন্য এ জিনিস পাবার উপায় কি ? সেই সমস্যার মীমাংসা হ'ল ফলের জন্য একটি হিম-ঘর তৈরি করবার পর। এখানে রবীন্দ্র এরপর থেকে বিভিন্ন ঋতুর উৎকৃষ্ট ফল সব সংগ্রহ করে অতঃপর হিমঘরে তা রক্ষার ব্যবস্থা করতেন।

পন্ডিচেরীতে স্বাধীনতা-সংগ্রামে সংগ্রামে চলাচলের পথ অবরোধ করত যাতে রাস্তা দিয়ে কিছু টুকাবার উপায় না থাকে। মায়ের আঙ্গুর ফলের পুঁজি নিঃ-শেষ হ'য়ে এসেছে। রেলপথ বন্ধ হয়নি বলে ভৃত্যটিকে বলতে পারলাম- 'কোদাই কানালে' যাও-১/২ টন আঙ্গুর কিনে নিয়ে এস'। 'ট্রেনেই ফিরে এস'। তার হাতে ঐ পরিমাণ টাকা দিতে আমার একটুও দ্বিধা হ'ল না। পরদিন নির্বিঘ্নে আঙ্গুর নিয়ে সে উপস্থিত হ'ল যথা সময়ে।

তামিলনাড়ু থেকে আমরা জ্বালানী কাঠ কিনতাম। ১০০ গরুর গাড়ীতে কাঠ বোঝাই হ'য়ে আসত। মধ্য মধ্যই কাঠ আনাতে হ'ত। শুল্ক দপ্তরের হাত দিয়েই সব পার করে আনতে হ'ত। সাধারণত ওখানে প্রতি গাড়ীর কাঠের ওজন নেওয়াবার নিয়ম ছিল। কিন্তু সর্বদাই এ ব্যাপারে আমি যা বলে দিতাম তাই ওরা মেনে নিত।

স্বাধীনতা সংগ্রাম পর্বে তামিলনাড়ু সীমান্তে স্বেচ্ছাসেবকরা গরুর গাড়ীগুলি আটকে দিত। শিব-লিঙ্গম আমার কাজের লোক এসে এ খবর দিল। আমি ওকে কম্যুনিষ্টট দলের নেতা সুব্বায়ার কাছে গিয়ে গাড়ীগুলি ঢুকতে সাহায্য করবার কথা বলতে বললাম। সেবারে সে গাড়ী ঢুকবার অনুমতি দিল বটে-কিন্তু প্রতিবারের জন্য নয়।

শিবলিঙ্গমকে আমি নিষিদ্ধ পথে মাঠ পার হয়ে আসতে বললাম। তখন সে পান্নরুটিতে গিয়ে এক মাল গাড়ী ভর্তি উৎকৃষ্ট ক্যাসুরিনা কাঠের জ্বালানি নিয়ে চলে এল।

মা আমার উপর পুরো বিশ্বাস নিয়ে নির্ভর করতেন। আমি যে সব ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতাম তার বিবরণ মাকে সর্বদাই দিতাম। মা ভাল ভাবেই জানতেন তাঁর ও আশ্রমের যা কিছু প্রয়োজন তা আমার দ্বারা পূর্ণ হওয়া সম্ভব।

একবার বালুভাই এর নেতৃত্বে এক ট্রেন বোঝাই মানুষ বরোদা থেকে এসে উপস্থিত হলেন। বাজার সেরে ফিরবার পথে তাঁকে আমি গেটের সামনে দেখতে পেলাম। তিনি ৫০০ জনের মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা চেয়ে বসলেন। আমরা পরস্পরের দিকে তাকালাম মাত্র এবং চোখের ইশারায় কথা সারলাম। "হ্যাঁ ১১.৩০ টার সময় খাবার প্রস্তুত থাকবে নিশ্চিত করলাম তাঁকে। সমস্ত জীবন আমার - আমার কাজ, সবিশ্বাসের আশ্রয় নিয়েই চলেছে-প্রশ্ন তুলে নয়।

১৩ই আগস্ট,৫২/৫৩ সনের কথা। প্রতি দর্শনের আগে মা সাধকদের শাড়ী বিতরণ করতেন। একটা স্টোরে শাড়ীগুলি রাখা থাকত। পূজালাল যিনি দায়িত্বে ছিলেন। তিনি মাকে সময়মত স্মরণ করাতে ভুলে গেলেন যে সেটাতে শাড়ী নেই। ১৩ই তারিখে মা আমাকে তডেকে বললেন- 'শাড়ী চাই বিতরণের জন্য'। আমি তখনি সোজা বাজারে গিয়ে মায়ের প্রয়োজনীয় সংখ্যার শাড়ীগুলি সংগ্রহ করে এনে দিলাম। এইভাবে মায়ের শাড়ীর ব্যাপারেও আমাকে হাত দিতে হয়েছিল।

আমাদের চপ্পলের (চটি জুতা) জন্য এবার চামড়ার অভাব দেখা দিল। কারণ যত চামড়া সব সৈন্যদের প্রয়োজনে চলে যাচ্ছে। আমাদের বলা হ'ল চটির জন্য প্রস্তুত করা চামড়া নেই। আমি তাই কসাইদের কাছে গিয়ে চামড়া চাইলাম। আমার মিটিয়ে তারা ভাল ভাবেই চামড়া সরবরাহ করল। আমরাও চটি তৈরী করতে সমর্থ হ'লাম। কুমুদের পিতা মণিভাইকে লিখে জানালাম আমাদের চামড়ার প্রয়োজনের কথা। বম্বে থেকে তিনি বান্ডিল বান্ডিল চামড়া সংগ্রহ করে এনে দিলেন। তাঁর ছোট ছেলে নবীন আনল এক বান্ডিল চামড়া মাথায় করে। সেই চামড়া নিয়ে আমি মাকে গিয়ে দিয়ে এলাম।

সে সময় সরকারী অনুমতি ছাড়া কেউ মিলের কাপড় নিয়ে কোথাও যেতে পারত না। মণিভাইকে একবার জানালাম মায়ের বিতরণের জন্য শাড়ী নেই। তিনি শাড়ী কিনে ট্রাক বোঝাই করে এনে মাকে উৎসর্গ করলেন। যদিও এই কাজের ফলে তাঁর জেল হ'তে পারত কিম্বা সব শাড়ীগুলি বাজেয়াপ্ত হ'তে পারত। মায়ের কাজে ভক্ত সাধকেরা অনায়াসে এই ধরনের ঝুঁকি নিতেন।

আমরা এখন একটু অন্য দিকে মন দেব। আমি এখন আমার সঙ্গে লেলের সংযোগের ঘটনাটি বলব। ১৯২২ সালে আমেদাবাদে লেলে আমাদের কলেজে আসেন। সেখানে তিনি আমাকে বেছে নিলেন বিশেষ মনোযোগ দিয়ে। আমাকে বললেন তোমার পিতা-মাতাকে। দেখাতে নিয়ে চল আমাকে। আমি একটি মোষের গাড়ীতে (যেহেতু বাস চলাচল ছিল না তখন) তাঁকে নিয়ে মা-বাবার কাছে গ্রামের বাড়ীতে গেলাম। তিনি তাঁদের দেখে ভারি প্রসন্ন হলেন। একবার তিনি আমার মত কিছু ছাত্রদের উদ্দেশ্য করে বললেন "গিরনার পর্বতে গিয়ে শ্রীদওাত্রেয়র চরণ বন্দনা করে এস সবাই মিলে।" আমরা কেউ কেউ গেলাম,ফিরে আসার পর তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করলেন "তোমার কি অভিজ্ঞতা হ'ল ওখানে গিয়ে ?" 'কিছু না' হ'ল আমার যথার্থ উওর। আমার গালে একটি চড় দিয়ে তিনি বললেন 'আমার সঙ্গে এস এবার।' তাঁর সঙ্গে আমি আবার গেলাম সেখানে। কিন্তু আমার মধ্যে কিছুই পরিস্ফুট হ'লনা। কারণ তা হবার ছিল না। পন্ডিচেরীতে চলে আসবার পর পুণাতে তিনি আমার বন্ধুদের আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা-বাদ করেন।

রবীন্দ্রনাথ ও C. F. Andrews আমেদাবাদে আসতেন ও আম্বালাল সারাভাইয়ের গৃহে থাকতেন। একবার আমরা পরস্পরকে ভালভাবে চিনি তা জেনে Andrews আমাকে লেলের সঙ্গে পরিচয় করালেন - ইনি চুনীভাই !'

এন্ড্রুজ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মনে পড়ছে ইন্দিরা প্রিয়দর্শনীর কথা। পরে তিনিও শান্তিনিকেতনে ছাত্রী হ'য়ে যান। এবং এই কারণে তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল খুবই আন্তরিক। যদিও আমি তখনকার অনেক বিশিষ্ট জাতীয় নেতাদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসি তবু দুজনকে আমি বিশেষভাবে ভালবাসতাম। পন্ডিত মদন মোহন মালব্য ও মতিলাল নেহেরুকে। আমার এখনও মনে পড়ে সেদিনের কথা যেদিন মতিলাল-অভিজাত সম্পদায়ের শিরোমণি রাত্রে ঘরের মেঝেতে শুতে শুরু করলেন বুঝবার জন্য তাঁর পুত্রের বৃটিশ জেলের মেঝেতে একটা যেমন-তেমন কম্বলের উপর শুয়ে কেমন লাগছে। মালব্যজীর সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধা ভালবাসা আজও একইভাবে আছে। মতিলাল সম্বন্ধে আমার মনোভাব এখন তাঁর পরিবারস্থ সকলের জন্য প্রসারিত হ'য়েছে। ইন্দিরা যখন ছোট্ট একটি পুতুলের মত তখন থেকে তাঁর প্রতি আমার গভীর স্নেহ অপরবর্ত্তিতভাবে রয়ে গেছে। একবার তিনি আশ্রমে একটা রাত কাটাতে চাইলেন। আমরা তখন দুতলায়। পবিত্রর দপ্তর-ঘরে তাঁর ব্যবহারের জন্য খালি করে দিলাম। তাঁর কর্মীদলের লোক ধাওয়ান শুধু আমার ঘরে রইলেন। একজন শান্ত্রী ইন্দিরার ঘরে পাহারা দিতে এলো। আমি তাঁকে যেতে বললাম। সে বললেন "মহাশয় এটা আমার কর্তব্য।" বললাম তখন "তোমার জায়গায় আমি দাঁড়িয়ে পাহারা দেব।" তখন সে স্থান ছাড়ল। তারপর সন্ধ্যা

৬টা থেকে পরদিন সকাল ৭টা পর্যন্ত তাঁর দরজার আমি পাহারা দিলাম। কারণ ইন্দিরাকে আমি ভালবাসতাম। এবং আশ্রমে তিনি এমন স্বচ্ছন্দে চলা-ফেরায় অভ্যস্ত তা দেখে মনে হ'ল এখানে ওঁর নিজেরই বাড়ী। মাঝে মাঝে আশ্রমে আসতেন-তাঁর কোন আপত্তি ছিল না যেন কোন পানীয় বা যে খাবারই তাঁকে দেওয়া হ'ক না কেন।

১৯৬৬ সাল, চিন্তা করছি শ্রী অরবিন্দের জন্মশত বর্ষ পূর্ত্তির সময় আসছে, আমাকে প্রস্তুতি নিতে হবে। সমস্ত বিশ্ব জানাবে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা। আমার ইচ্ছা ২০,০০০ লোক অন্তত ঐ পবিত্র দিনটিতে এখানে উপস্থিত থাকবেন। এতগুলি মানুষকে কি খেতে দেওয়া যাবে ? আমরা যদি সাধারণ কাঠের উনানের ব্যবস্থা করি তাহ'লে অন্তত ৫৩টি উনুনের দরকার হবে। ওগুলি ঠিকমত বসাতে হ'লে পুরো ডাইনিং হলটি ভেঙ্গে ফেলতে হবে। নানা কারণেই সেটা ঠিক হবে না। অন্যান্য কি পন্থায় কার্য উদ্ধার হয় তাই চিন্তা করতে লাগলাম। ষ্টীম এর সাহায্যে রান্নাই এক্ষেত্রে সম্ভব বলে মনে হ'ল। কিন্তু এই পদ্ধতিতে রান্না করতে জানে কে ? তখন মনে পড়ল মাদ্রাজে অবধি কংগ্রেস অধিবেশনের সময় ষ্টিম এ রান্নার পদ্ধতিতে এক লাখ লোকের রান্না হয়েছিল। ১৯৬৭ সালে 'বয়লার' এর সন্ধান করতে লাগলাম। একটু কম দামের মধ্যে। একটি রহস্যজনক ঘটনার মত মনে হয় যোগাযোগটি। যারা চাঁদে গিয়েছিল তারা ফিরে এসে যে মুহূর্তে পৃথিবীর ভুমি স্পর্শ করল ডাইনিং রুমের গেটে ঠিক তখনই রান্নার বয়লার এসে পৌঁছাল। ১৯৬৮-৭২ পর্যন্ত চলল আমাদের শতবার্ষিকী পূর্তির মহা আয়োজন। কাজুবাদামের বরফি তৈরী করতে হবে। আমরা ৬০০Kg কাজু বাদাম কিনলাম পান-রুটি থেকে। সবাই আমার জিজ্ঞাসা করল যদি ২০,০০০ লোক না আসে ? কি আর হবে সবাইকে কাজুর মিষ্ঠি দিয়ে দেব আসলে।

মা আমাকে তো কোন নির্দেশ দিতেন না। ভিতরে ভিতরে শক্তি ও বিশ্বাসের সৃষ্টি করতেন আর আমি এগিয়ে চলতাম আমার লক্ষ্যের দিকে।

আশ্রম তো উৎসর্গীত অর্থের সাহায্য চলত। যারা আসত আশ্রমকে ভালবেসে কিছু দিয়েই যেত। আশ্রম বরাবর এই ধরণের অনিশ্চিত সাহায্যের উপর চলছে - এখন পর্যন্ত। আমাদের নিয়মিত কোন আয় বা আদায় ছিল না। বড় বড় জাঁদরেল ব্যবসায়ীরাও নিয়মিতভাবে কিছু দিতেন না। বহুদিন আগে বিড়লা যখন দিলীপ রায়ের স্বর্ণ-জুবলীতে ১০,০০০ টাকা উপহার দেন দীলিপ তখন সেই অর্থ মাকে উৎসর্গ করেন। খুব সাধারণ অতি-সাধারণ মানুষেরাই মাকে দেয় আর এখনও তাই। সরকার অবশ্য আয়-কর হিসাবে কিছু নেন না। সেটা অবশ্য একটা বড় সাহায্য যা বরাবর কাজে লেগেছে আমাদের।

যদিও মায়ের অর্থের প্রয়োজন হ'ত সব সময়ের তবুও মা ছোটদের (নাবালক) সম্পত্তি কখনও গ্রহণ করতেন না। যদি কোন পরিবার তাদের সম্পত্তি ঐ ভাবে উৎসর্গ করতে চাইত মা বলতেন "বাচ্চারা আমাকে জানে না - যখন তারা বড় হয়ে স্বেচ্ছায় আমাকে দেবে-তখনই ঠিক হবে।" ছোটদের সম্পত্তির অংশ এসে পড়লে তিনি রেখে দিতেন,- বয়স হ'লে তারা এসে ফেরৎচাইলে তিনি তাদের তা দিয়ে দিতেন তখন ১৪ বছরের নীচে কোন বালককে আশ্রমে নেওয়া হ'তনা। মাকে সেচ্ছায় ভালবেসে কিছু দিলে মা খুশী হ'য়ে তা গ্রহণ করতেন নতুবা তা ফেরৎ দিতেন। একবার এক দম্পতি আশ্রমে এলেন। মহিলাটি তাঁর সব স্বর্ণাভরণ মাকে উৎসর্গ করে দিলেন পরে আবার কোনো সময়ে সে সব ফেরৎ চাইলেন। মা তখনি সে সব প্রত্যর্পণ করলেন।

১৯৭২ এর জানুয়ারী পর্যন্ত আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য লড়াই চালিয়ে যেতে হ'ল। দশকের পর দশক আমাদের এমনিতর যুদ্ধ করতে হ'য়েছে - ঐ পর্বটুকু বাদ দিয়ে যখন মনোরঞ্জন গাঙ্গুলী এবং কিছু পরে নবজাত আশ্রমে এসে পড়লেন তাঁদের পারিবারিক সম্পত্তি সমেত। যখন ঐরকম সঙ্কটপূর্ণ সব অবস্থার মধ্যে দিয়ে যেতে হ'ত মা কাউকেই কিছু বলতেন না-এইটে কর বা ওইটে কর না। কারণ মা জানতেন যে মানুষের প্রকৃতি এমন যে কিছু বললে- তার আঘাত ফিরে আসবে তাঁর কাছে। নানা দাবি-দাওয়া নিয়ে আসবে শত শত চিঠি-আমার এটা চাই- ওটা চাই।

যখন স্বেচ্ছাসেবক দলের দরকার পড়ল - তিনি নিজেই বিজ্ঞপ্তি দেন প্রথমে-পরে আর দিতেন না। দেখতে পেলেন তারাই উপস্থিত হ'চ্ছে-যারা প্রচুর কাজ হাতে নিয়েছে। তিনি নিজের ইচ্ছে কখনও কারুর উপর আরোপ করতেন না। ১৯৭১ এর শেষ দিকে আমরা এমনভাবে ছড়িয়ে ছিলাম যে মা নতুন লোক নেওয়া বন্ধ করলেন। আবার যখন এগুলো সম্ভব মনে হ'ল তাঁর এমনভাবে সব ব্যবস্থা গুছিয়ে করলেন যে পরিস্থিতির অনেক উন্নতি হ'ল। আর্থিক অবস্থা অনেক স্থিতিশীল অবস্থায় এসে পৌঁছাল।

মা কি আমার মধ্যে দেখেছিলেন জানিনা। সম্ভবত ১৯৭৫ সালের কথা নলিনী, অমৃত, উদার ও পবিত্রর উপস্থিতিতে তিনি বললেন আমাকে লক্ষ করে "দ্যুমন, তোমাকে কিছু বলছি - ভুলে যেওনা যেন ! আমি তোমাকে ১৯২৭ সালের মে মাসে প্রথম দেখি। তখন শ্রী অরবিন্দকে বলেছিলাম- "এখুনি আমি তিনটি মানুষকে দেখে বলতে পারি প্রথম জন হল ...অন্য জন...কিন্তু তৃতীয় জন অনেক দূরে যাবে -অনেক দূর।" বলতে পারব না কেন তিনি একথা বলেছিলেন আমার সম্বন্ধে।

কিছুদিন আগে তিনি জানতেন চাইলেন আমার কাছে 'কোন বছরে তোমার জন্ম ?' উওরে বললাম ১৯০০ সালে মা। তখনি উনি বললেন "তুমি-তুমি নেমে এসেছ সেবার জন্য-" এখনও এটাই স্থির আছে।

আশ্রমে যোগ দেবার পর আমার সহযোগিরা কেউ কেউ নানা ভাষা লিখতে আরম্ভ করলেন। তাঁরা অনেক পড়াশুনা করে অনেক বই-পত্র লিখেছেন। কেউ কেউ সমুদ্রেরে ধারে গিয়ে কতক্ষণ বসে কাটান। কিন্তু আমি শুধু সেবা ছাড়া আর কিছু করিনি। আমি খেলোয়াড় ছিলাম একসময়ে এবং এত ছুটাছুটি করতে পারতাম যার জন্য বন্ধুরা নাম দিয়েছিল "হরিণ"। তারা এখন অবাক হ'য়ে যায় ভেবে আমি কি করে আগুনের শান্তি জীবন ধারায় স্থিতি লাভ করলাম। যখন শ্রীঅরবিন্দের দর্শন পেলাম তখনই আমার মধ্যে শান্তি নেমে এল। কিন্তু সে ভাবও মুছে গেল। লোককে সুস্থ করে তোলার শক্তি ছিল আমার-রোগ-মুক্তি দিতে পারতাম মানুষকে। শ্রী অরবিন্দ আমাকে এ বিষয়ে বিরত থাকতে নির্দেশ দিলেন। আমি বাইরে কোথাও কিছু কখনো দেখতে যেতাম না। আশ্রমের সিনেমা দেখতেও যেতাম না কোন দিন। মনে হ'ত ওতে কাজের বিঘ্ন ঘটবে। একমাত্র সেবাকে কেন্দ্র করেই আমার জীবন ধারা আবর্তিত হয়ে চলেছে। শ্রীমা ও শ্রী অরবিন্দের কৃপায় আমার কোন দিন কোন কিছুই অসম্ভব বলে মনে হয়নি। আমি তাঁদের যত জাগতিক ব্যাপারে উদ্বেগ, দুর্ভাবনা নিজের উপর টেনে নিতে চেষ্টা করেছি। শ্রী মা ও শ্রীঅরবিন্দের কাছে কখনও কাউকে কোন দুশ্চিন্তা উদ্বেগ নিয়ে যেতে দিতে চাইতাম না। দ্বিতীয় মহাযদ্ধের সময় শ্রীঅরবিন্দ সমস্ত গম আশ্রমের জন্য উওর ভারত থেকে আসে জেনেও একদিন জিজ্ঞাসা করলেন "তোমার গমের অবস্থা কি ?" বললাম "চিন্তিত হবার মত কিছু নয়। " এটা বলছি এই জন্য যে আমি তাঁদের ভার লাঘব করতে সর্বদাই সচেষ্ট থাকতাম।

একবার আশ্রমে যখন অত্যন্ত আর্থিক সঙ্কট চলছে শ্রীঅরবিন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন কেউ "যদি এখন ৫০০ জনকে খাওয়াতে হয় কি করবেন?" তিনি বলে উঠলেন "কেন দ্যুমনের কাছে পাঠিয়ে দেব।"

১৯৭১ সালে একদিন মা স্নানের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে হঠাৎ বলে উঠলেন- "দ্যুমন শ্রীঅরবিন্দ তোমায় লক্ষ করছেন। তিনি তোমাকে পেয়ে খুব খুশি। ধীরে ধীরে আমি তাঁর আরো কাছে আসতে সমর্থ হ'লাম আমার সেবা ও বিশ্বস্ততার মধ্যে দিয়ে।

১৯শে জুন ; ১৯৩৪ এর কথা। মা আমাকে বললেন "যাও রান্নাঘরে গিয়ে বলে দাও - আজ তোমার জন্মদিন। 'তারা' তখন ছিলেন মায়ের রান্নাঘরের দায়িত্বে। সেদিন ছিল বুধবার। বিশেষভাবে কিছু রান্নার দিন। সেদিন তারা ১১ রকম পদ রান্না করলেন। তখন থেকে ডাইনিং রুমে আমার জন্ম দিনের বিশেষ কিছু রান্নার ব্যবস্থা হ'তই।

একবছর শ্রী মায়ের নির্দেশে খেলার মাঠে ডাক পড়ল আমার জন্মদিন পালনের জন্য। দুজন যুবক পরস্পরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমাকে তুলে নিয়ে তাদের হাতের উপর বসিয়ে সমস্ত মাঠ পরিক্রমা করল। মা তখন সেই অবিভক্ত ভারতের মানচিত্রের দাঁড়িয়ে

আছেন। প্রণব সেখানে থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন - দ্যুমন - বন ফেত দ্যুমনকে। আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিলাম। এখন থেকে প্রতি বৎসরে প্রণব ও আমার জন্মদিন পালিত হতে আরম্ভ হলো খেলার মাঠে। ১৯৫৮ থেকে মা খেলার মাঠে যাওয়া বন্ধ করার পর আমরাও আমাদের জন্মদিনে খেলার মাঠে যাওয়া বন্ধ করলাম।

সাধারণত মা আমাকে জন্মদিনে কোন উপহার দিতেন না। তাঁর যা দেবার তা তিনি আমার অন্তরেই দিতেন। আমিও তা অন্তরে গ্রহণ করতাম। তিনি অগুগতি জিনিস বিতরণ করতেন-বই ইত্যাদি জন্মদিনে যাঁরা আসত তাঁর কাছে--। আমাকে কিন্তু কখনও কিছু ওভাবে দিতেন না। যখন আমি নীচে ন্যাপকিন বিতরণ করতে যেতাম - আমি তাঁকেই সর্বপ্রথম ৫০ এর একটি প্যাকেট দিয়ে দিতাম তাঁর নিজের ব্যবহারের জন্য। তবে মা চম্পকলাল প্রণব সকলকে দিতেন, কিন্তু আমাকে কখনও নয়। এমনকি দর্শন বার্তার কার্ডও নয়। আমি প্রথমেই মায়ের হাতে কার্ডগুলি দিয়ে দিতাম। আমার জন্য কিছু পেতাম না। যদি অন্য কেউ আমাকে দিত তবেই আমি পেতাম। নইলে নয়।

মা বলতেন "তোমার এ সবের জন্য ইচ্ছা হয়না।" "হ্যাঁ মা, যতক্ষণ তুমি এখানে আছ আমার কোন জিনিসের জন্য ভাবনা নেই।"

On my birthday in 1962, the Mother wrote :

"To Dyuman
the wonderful worker
most faithful to his ideal
Bonne Fete
With love and blessing
for
a happy continuation"

"দ্যুমন কে
বিস্ময়কর কর্মী সে
আদর্শের প্রতি যার পরম নিষ্ঠা।
শুভ জন্মদিন
ভালোবাসা ও আশীর্বাদ
চলুক সুখের পথে তার নিত্য অভিষেক।"

১৯৭২-এ মা লিখেছেন :

দ্যুমনকে
শুভ জন্মদিন

দীর্ঘ, দীর্ঘ, আরো দীর্ঘ সুখী ও উপযোগী জীবনের জন্য ভালোবাসা ও আশীর্বাদ।

১৯ শে জুন, ১৯৭৩, মা বিশ্রাম করছিলেন। বন্ধু এবং সাথীরা প্রণব ও চম্পক তাঁকে জাগিয়ে তুললেন- "মা আজ দ্যুমনের জন্মদিন।" "আমার একটা ফোটো আমায় দাও, আমি ওকে দিকে চাই। তিনটি ছবি ছিল - একটি বেছে নিয়ে বললেন, "একটি কলম দাও-সই করব।" দেখা গেল ছবিতে তিনি আগেই সই দিয়ে রেখেছেন।

কোন জিনিসের জন্য আমার প্রয়োজন বোধ ছিল না। কিন্তু দেওয়ার ব্যাপারে সে আলাদা। মায়ের সব অলঙ্কার যখন আমার কাছে ছিল আমি তাঁর সন্তানদের - যাঁরা তাঁকে সেবা করেছেন- তাদের জন্য মায়ের কিছু জিনিস রাখতে চাইতাম - যদিও তাদের কিছু দেবার অবস্থা এছিল না। তখন কুমুদ ছিলেন না-বসুধাই মায়ের দেখাশুনা করতেন। আমার মনে হল কুমুদের কাছে মায়ের কিছু নেই। আমার কাছেও কিছু ছিল না- মায়ের গহনা সব বিক্রী হয়ে গিয়েছিল। মায়ের হাত দিয়ে কুমুদকে কিছু দিতে ইচ্ছে হ'ল। আমি একটা সোনার হার পেলাম শ্রীমাও শ্রীঅরবিন্দের প্রতীকের লকেট শুদ্ধ। ১৩ই জুন, ৭৩ সালে আমি তাকে সেটি দিলাম-ধরেই নিলাম আমার মধ্যে মা-ই তাকে দিচ্ছেন। কিন্তু হারটি আমি তাকে মায়ের ঘরে রেখে দিতে বললাম। যদি সুযোগ আসে মায়ের কাছে প্রার্থনা করব জিনিসটি কুমুদকে দেবেন তাঁর নিজের হাতে। তাঁর দয়ার সুযোগ নিতে গেলাম আমরা। মাকে বলতে পারলাম - "মা আজ কুমুদের জন্মদিন আমরা কিছু তাকে দিতে চাই। কুমুদ তখনই লকেট দেওয়া হারটি বের করে নিয়ে এল-মা নিজের হাতে তার গলায় পরিয়ে দিলেন।

একদিন মা আমার ডান হাতটা তাঁর হাতের মধ্যে নিয়ে বললেন "লক্ষ্মী তোমার বন্ধু।" একবার তিনি আমাকে গণেশের ছবি উপহার দিয়ে পিছনে একটি ছোট্ট কথা লিখলেন - "তিনি তোমার এক উদার বন্ধু হ'য়ে উঠুন।

এক এক করে আমার বন্ধুরা সবাই চলে গেলেন। প্রথম চলে গেলেন অমৃত। তার অনেক কাজই আমার হাতে এল। যখন সত্যকর্মা চলে গেলেন - তাঁর কাজের ভারও পড়ল আমার উপর। দুবছর পরে কুণুমাও এসুখে পড়লেন-আর চলা-ফেরাও করতে পারছিলেন না। তাঁর কাজও কিছু আমাকে নিতে হ'ল। আমার শরীরকে জিজ্ঞাসা করলাম, শরীরের উওর "এগিয়ে চল" সাধারণ শরীর, কিন্তু এযাবত ভালভাবেই কাজে

সাড়া দিয়েছে। মাঝে মাঝে মানিঅর্ডার রসিদ ও অন্যান্য কাগজ পত্রে দিনে হাজার সই করি। কিন্তু কে আমাকে শক্তি দেয় ! কেবল তিনি-মা।

গত ৬০ বছর ধরে ডাইনিং রুমের কাজ নির্বিঘ্নে কেটে গেছে। যখন যে সমস্যা হয় সমাধানের জন্য মায়ের কাছে প্রার্থনা করি।

কাজে বা জিনিস-পত্রের প্রতি কোন আসক্তি নেই আমার। কিন্তু তাদের আছে উপযোগিতা - প্রয়োজনীয়তা তাই আমি তাদের দায় বহন করে এসেছি। কিন্তু মা হলেন অসীম, এক বিরাট বারিধিময় সওার মধ্যে সদাই বিচরণশীল। যদি আমরা তাঁর এই মহান পরিচয় নিতে না পারি তবে আমরা তাঁর প্রতি বিশ্বাসের অমর্যাদা ঘটাব। মায়ের ব্যক্তরূপ গ্রহণের মধ্যেও রয়েছে তাঁর বিশ্ব-জনীনতার ভাব। তাঁর অপার্থিব সওায় তিনি হলেন অনন্ত-অসীম।

বরাবরই আমি একটি সামগ্রিক, সামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থার মধ্যে কাজ করতে পছন্দ করি। প্রথমে গ্লোরিয়ার খামার বাড়ীটি হ'ল - তারপর আরো কয়েকটি - 'অন্নপূর্ণা' সমেত। কিন্তু অরোভিলের লোকেরা বলতে লাগল- "এটা আমাদের"। আমি ওটি ছেড়ে চলে এলাম। যদিও আমরা ওর পিছনে লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করি- এবং একাদিক্রমে ৪ বছর ওখানে প্রচুর পরিশ্রম করা হয়। মা তাঁর অরোভিলের সন্তানদের প্রতি গভীর স্নেহ পোষণ করতেন। একদিন মাকে একটি মানচিত্র দেখালাম -যেখানে অরোভিল ও আশ্রমের লেক অঞ্চলের জমিগুলি মিলেমিশে গেছে। তখন তিনি আমাকে বললেন "তোমাকে অরোভিলে প্রতিদিন ৫০০০ লিঃ দুধের যোগান দিতে হবে-. মায়ের প্রস্তাব শুনে বললাম 'হাঁ-মা'।এবং এই উদ্দেশ্যে 'অন্নপূর্ণা' খামারের বছরের পর বছর কাজ করে গেছি....কিন্তু.....

কোন কোন সময় বুঝতাম যেন মুহূর্ত থেকে মহূর্ত পার হ'চ্ছি। একবার মাস কেটে গেল অর্থ-দপ্তর থেকে কোন অর্থ গ্রহণ করা হলনা। টাকার টান ছিলই তহবিলে। কিন্তু মায়ের দয়ায় আমি ডাইনিং রুমের সব খরচ সামলে নিলাম। ধীরে ধীরে অবস্থার উন্নতি হ'ল এবং মা আমাদের আরো মজবুত আর্থিক পরিস্থিতির মধ্যে শেষ পর্যন্ত দাঁড় করিয়ে দিলেন। সেটা ১৯৭২ সালের জানুয়ারীর কথা।

যখন প্রথম আশ্রমে এলাম- আমার স্বপ্ন ছিল এখানে কমপক্ষে ১০,০০০ মানুষের স্থান হবে একদিন। কিন্তু সেক্ষেত্রে আশ্রমবাসীদের সেইভাবে বসবাস করতে শিখতে হবে সেই উদ্দেশ্যে -যে উদ্দেশ্য নিয়ে আশ্রমের উৎপত্তি হয়েছিল। আমাদের কাছে এটা বড় কথা নয়-কেউ টাকা পয়সা নিয়ে আশ্রমে এল কিনা। যখন আমি এসেছিলাম তখন একটি কানাকড়িও আমার হাতে ছিল না। ছিল শুধু আমার হৃদয় তাঁকে উৎসর্গ করে দেবার জন্য-তিনি তা গ্রহণ করেছিলেন।

আশ্চর্য দিব্যের ক্রম-আবির্ভাব ! একদিন এমন উষার সূচনা হবে যখন দিব্য-অতিমানস জগৎ সত্য-চেতনায় প্রতিফলিত হবে। সবোত্তম বিধির প্রতিষ্ঠা এবং দিব্য সম্প্রসারণ ঘটবেই এ জগতে। সৎযম্ ঋতম্ ও বৃহতের প্রসাদ-পূত হবে বিশ্বজগৎ।

শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রী মা আমাদের পৃথিবীতে এই জিনিসিই আনতে চেয়েছিলেন। আমাদের দেখিয়ে গেলেন তা এ জগতে সম্ভব। এবং একদিন তা প্রকট হবেই।

যদি সত্য ভাবে আমরা আন্তরিক ব্যগ্রতা নিয়ে অস্পৃহাপরায়ণ হতে পারি এই জিনিসের আবির্ভাব ত্বরান্বিত হবে। তবে আমার ক্ষেত্রে এ বিষয়ে রায় বেরিয়ে গেছে। জগত একদিন সত্য-চতনার প্রতিষ্ঠিত হবেই।

শ্যামকুমাারী বলেছেন- "একবার দ্যুমন সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের কয়েকটি উদ্ধৃত লেখা মাকে দেখানো হয়েছিল। তাঁর সেগুলি এত ভাল লেগেছিল যে শুধু দ্যুমনকে নয়-আরো কয়েকজনকে-যেমন অমৃত, চম্পকলাল, পবিত্র,নলিনী ও উদারকে ডেকে শ্রীঅরবিন্দের এই অত্যুজ্জ্বল প্রশাস্তিগুলি নিজে পাঠ করে শোনান। পড়বার পরে মাও যোগ করলেন "এসব কথা এখনো সত্য"। এই অতুলনীয় কাহিনীর সঙ্গে সেই উদ্ধৃতিগুলি এবং শ্রী অরবিন্দের আরো দীর্ঘতর একটি পত্র যা মা-ও পড়েনি যোগ করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

"তোমার মিতব্যয়িতার মাত্রাবোধের চেতনা খুবই মূল্যবান। এবং আমাদের পক্ষে একান্তভাবেই সহায়ক। আরো এই কারণে যে আশ্রমেও বস্তুটি দুর্লভ-। এখানকার মাত্রা জ্ঞানহীনতা চেতন বা অবচেতন যেখানে থেকেই আসুক-একেবারেই বিপরীত পথ-গামী।"

৬.৩.১৯৩২।

" দ্যুমন চরিত্রের শক্তি নিহিত-লক্ষ্য অভিমুখে তার অপরিহার্য ঋজুতা। উচ্চতম বলে যা সে গ্রহণ করে তার প্রতি তার বিশ্বস্ত আনুগত্য, তা থেকে আলো পাবার ও তাকে সেবা দেবার তীব্র ইচ্ছা।"

১৪.৪.১৯৩৪

" বাস্তবিকই খুব ভাল করেছ- সর্বদাই যেমন, নিজেকে দিয়ে প্রমাণিত করেছ মায়ের শক্তির উওম নির্ভরযোগ্য যন্ত্র তুমি।"

১৮.৭.১৯৩৫

"দ্যুমন এবং আরো কয়েকজন যদি নিজেদের মায়ের যন্ত্ররূপে প্রস্তুত না করত এবং তাঁকে আশ্রমের বস্তুগত দিকটি নতুন করে গড়ে তুলতে সাহায্য না করত তবে এ আশ্রম-ভুল পরিচালনা অপচয়, আত্মপ্রশ্রয়, অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা, স্বেচ্ছাচারী আচরণের চাপে অনেকদিন আগেই শ্বাসরুদ্ধ হ'য়ে যেত। সে এবং আরো কয়েকজন নিন্দা ও ঘৃণার পাত্র হ'য়েছে মাকে আশ্রমের কাজে সাহায্য করতে গিয়ে"।

১৯৩৬

"আনুগত্য, বিশ্বস্ততা, সামর্থ্য, ইচ্ছা শক্তির বল এবং আরো অনেক গুণ সবই তোমার প্রচুর আছে। আরো অনেক গুণ সবই তোমার প্রচুর আছে। আরো আছে একটি পরিপূর্ণ প্রশান্তি ও সমতাবোধ শুধু আন্তর সত্তায় নয়-যেখানে তা ভালভাবেই বিরাজ করতে পারে-আগে থেকেই বিদ্যমানতা রয়েছে। এবার বহি প্রকৃতির স্নায়ু-মন্ডলেও তা তোমাকে সম্পূর্ণভাবে পেতে হবে।"

২৭.৯.১৯৩৬

"আমি জানিনা নির্দেশগুলি সম্পর্কে এত অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে কেন। বহুবছর ধরেইত এই কাজ করছ এবং নিশ্চয়ই জানো দ্যুমন কিভাবে কাজ চালিয়ে গেছেন-অধিকাংশ ক্ষেত্রে করণীয়ই বা কি। যে সব ক্ষেত্রে অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে কোন দিশা মিলছেনা- তুমি সে সব বিষয়ে নিজে যা ভাল মনে কর তাই করতে হবে। দ্যুমনের কার্য-পদ্ধতি অসম্পূর্ণ হলে নিজের বিচার-বুদ্ধি খাটিয়েই কাজ করতে হবে। কোন ক্ষেত্রে দ্যুমন ভুল বুঝলে তাঁকে বুঝিয়ে বলবে।

বাকী বিষয়ে তাঁর কর্মপদ্ধতি নিয়ে তোমার বিচারের সঙ্গে মায়ের তার ও তার কাজ সম্পর্কে যে অভিমত তা মিলছেনা। মা তাঁকে দেখছেন আশ্রমের একজন সামর্থবান কর্মীরূপে, অত্যন্ত যোগ্য সংগঠক। পরিশ্রমী মানুষ রূপে। তিনি নিজেকে কখনো ছেড়ে দেননা- মা তাঁকে সেভাবে বাধ্য না করলে। তিনি এমন ধরণের কর্মী যে কাজের ভিতরে অনায়াসে প্রবেশ করতে পারেন। মায়ের মতামতের মর্যাদা দিতে জানেন, শুধু বিশ্বস্ততা রক্ষা করে নয়। সামর্থ ও সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করবার অধিকার নিয়ে। একাধিক ক্ষেত্রে লক্ষ্য করে দেখা গেছে, যে সব কাজের তাঁর উপর ন্যস্ত করা হ'য়েছে যে তাতে পরিশ্রম হয়েছে সর্ব-নিম্ন, পারঙ্গমতার দিক থেকে তা হ'য়েছে সর্বোৎকৃষ্ট। অবশ্যই একথা ঠিক যে পরিশ্রম বাঁচানোর কাজের দিক থেকে প্রধান বিচার্য নয়। আরো এমন কিছু বিষয় যা ও

সমান প্রয়োজনীয় অথবা বেশী, নীতির দিক থেকে বলা চলে প্রকৃতি বা স্বভাব অনুযায়ী প্রত্যেকেরই কাজের সুযোগ থাকবে। এরকম ভাবে চলতে পারে সে সব ক্ষেত্রেই যেখানে মানুষ স্বাধীন ভাবে নিজের কাজটুকু করে নিতে পারে। যেখানে অনেক একসঙ্গে মিলে কাজ করতে হবে সেখানে এ নীতির ব্যতিক্রম হবেই। এক্ষেত্রে প্রথমে রক্ষা করতে হবে নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা।

মায়ের সম্বন্ধে তোমার মন্তব্যটি বুঝলাম না। Aromme'র (যে বাড়ীতে এখন ডাইনিং 'হল' অবস্থিত) সম্পূর্ন কাজ, গোলাবাড়ীর ও গৃহ-নির্মাণ বিভাগের যত কাজ সবই তো মায়ের ব্যবস্থাপনায় চলছে। সাধারণভাবে শুধু উদ্দেশ্য পরিকল্পনা নির্ধারণের বিষয়ে নয়- খুঁটিনাটি বিষয়েও মাকে চিন্তা করতে হয়। কাজের সর্বাঙ্গীণ পরিস্থিতি সঠিক অবস্থায় দাঁড়ানোর পরেই মা সরে এসেছেন ঠিকই কিন্তু এখনও তাঁকে সেদিকে পুরোপুরি লক্ষ রাখতে হয়। মায়ের ব্যবস্থা ও পরিকল্পনা অনুযায়ী লোকেরা এখান কাজ করে। যখন অবস্থা এরকম ছিল না- মা সাধকদের নিজ নিজ ধারণার স্বভাব অনুযায়ী কাজ করতে সুযোগ দিয়েছিলেন- নিজের অভিমতটুকু মাত্র ব্যক্ত করে- কিন্তু তাকে কার্যকরী করার জন্য কোন দৃঢ়তা প্রকাশ না করে। - সে সময় সমগ্র আশ্রমই হ'য়ে দাঁড়াল একটি নৈরাজ্যের দৃশ্যপট। চলতে লাগল ভুল বোঝাবুঝি, অপচয়, বিশৃঙ্খলা, আত্ম-প্রশ্রয়, সংঘর্ষ ও দ্বন্দ্ব। উশৃঙ্খল অবাধ্যতা। এই স্রোত যদি চলতে দেওয়া হত তবে এতদিনে আশ্রমের অস্তিত্ব থাকত না। এই অবনতি রোধ করতেই মা দ্যুমন এবং আরো কয়েকটি সাধককে বেছে নিলেন যাদের উপর তিনি তার উদ্দশ্য সাধনের জন্য নির্ভর করতে পারতেন। এদের সাহায্যে সমস্ত কর্ম বিভাগ গুলো পুনর্গঠিত করলেন, সুবিন্যস্ত করে সব দিকের ছোট খাটো ব্যাপারগুলোর প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি রাখলেন বিভাগীয় কর্ম কর্তাদের এমনভাবে সাহায্য করলেন যাতে যথাযথ শৃঙ্খলাও নির্ভুল পদ্ধতিতে কাজ চলে। তবু যেখানে কিছু কিছু পুরানো গোলযোগ রয়ে গেছে তা শুধু কর্মীদের শৃঙ্খলাবোধের অভাব বা পুরানো অভ্যাস পরিত্যাগ করবার অনিচ্ছা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। এখনো যদি মা দৃঢ় হাতে রশি টেনে না রাখেন তবে সব ভেঙ্গে পড়বে।

"তোমার এ ধারণা ভুল দ্যুমন মায়ের কাছে গোপন করেন, মাকে না বলে খুশিমতো চলেন। মা সবই জানেন, এমন অবস্থা হয়না যে কোন কিছু তাঁর অগোচরে ঘটতে পারে। তোমার দ্বিতীয়পত্রে যে বিষয় উল্লেখ করে লিখেছ তা তাঁর অজানা নয়। শত শত প্রতিবাদ, অভিযোগ-অনুযোগ তাঁর বিরুদ্ধে (অন্যান্য বিভাগীয় কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধেও যেমন আছে) তাঁর কার্য-পদ্ধতির বিরুদ্ধ, তাঁর খূঁটি-নাটি ব্যপারে প্রখর দৃষ্টির বিরুদ্ধে সাধারণ ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে- খরচ-খরচা সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে-তাঁর কড়া নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে ইত্যাদি সব কিছুই মায়ের খেয়ালে আছে। যেখানে পরিবর্তনের

প্রয়োজনীয় কারণ দেখতে পেয়েছেন তখনি তার সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়েছেন। তবু heyমা দ্যুমনকে বরাবর সমর্থন করেছেন। কারণ যে সব কারণে অভিযোগ-যেমন মিতব্যায়িতা, শৃঙ্খলা বিধান ; সাধকদের অজস্র খেয়াল ও আবদারের কাছে নতি স্বীকার না করা - এই সব নীতি ঠিক - সেগুলি যা মা নিজেই চেয়েছেন। এই সব দুর্নীতি রোধ না করলে মা যেভাবে কাজ করে যেতে চেয়েছিলেন তা আদৌ সম্ভব হ'তনা। দ্যুমন যদি শিথিল হ'তেন, প্রশ্রয়দাতা ও জনপ্রিয়তা লাভে প্রয়াসী হতেন- তবে মায়ের কাজের যন্ত্র হ'তে পারতেন না। তার প্রকৃতিতে যেসব ত্রুটি আছে- তা মায়ের দায়িত্বের ক্ষেত্র। যদি কোথাও অতিরিক্ত কাঠিন্যের ঝোঁক দেখা গিয়ে থাকে তা পরিবর্তনের দায়িত্ব মায়েরই। মা কিন্তু অহং ও বাসনার থেকে উদ্ভুত নানা অভিযোগ ও গোলযোগের স্বীকৃতি দিতে কখন প্রস্তুত ছিলেন না।

তিনি এসব জিনিসের কাছে নত হ'লে পুরনো অব্যবস্থায় ফিরে আসে এবং আশ্রম-পর্বের পরিসমাপ্তি ঘটত।"

শ্রীমতী শ্যামকুমারীর মূল বই
How They Came to Sri Aurobindo
and The Mother
এর "Dyuman -The Luminous One"
(দ্যুমন-দ্যুতিমান)